ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

জুন ২০১৫ উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা ₹১০

বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা : প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যোগ
ড. ঈশ্বর ভি বাসবরেড্ডি

আয়ুর্বেদের উদ্ভব ও বিকাশ
ডা. ডি সি কাটোচ

হোমিওপ্যাথি-স্নিগ্ধ শুশ্রূষা
ডা. রাজ কে মানচান্দা
ও
ডা. হারলীন কাউর

International Day of Yoga 21 June
Yoga for Harmony & Peace

এগিয়ে চলেছে ভারত

সংস্কার : বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বিকাশের চাবিকাঠি
প্রভাকর সাহু ও অভিরূপ ভুঁইয়া

শক্তিক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় উত্থান
কে আর সুধামন

অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশে কর্মসংস্থানের বিকাশ
দীপক রাজদান

INDIA/BHARAT 2015 Reference Annuals available as Easily Downloadable E-Books

Some good news for people looking for credible, authentic and updated information about our country. The prestigious Reference Annuals **INDIA & BHARAT 2015**, are now available as easily downloadable e- books ! The books which are brought out for the past 59 years consecutively by the Publications Division, Ministry of I&B, are witness to the multi-faceted efforts of Indian people towards national progress and well-being. The Reference Annuals have for long formed the bedrock of knowledge for those appearing in competitive exams in the country. Now as e-books these will be more user friendly, and more accessible as reference material in the digital mode.

Launching the e-books **INDIA-2015** and **BHARAT-2015**, on 7th May 2015 at New Delhi, Hon'ble Minister for Ministry of Information and Broadcasting Shri Arun Jaitley said that the availability of these publications on e-mode would enable the digital medium audience to utilize the wealth of information on India at large. He said by placing itself on the digital mode, Publications Division has come in tune with the contemporary changes taking place in the publications industry.

The e-books conform to the best international standards technically and are a faithful replication of the print version of the books. The **e-INDIA/ e-BHARAT 2015** have a variety of reader-friendly features for better communication like hyperlinks, highlighting, book marking and interactivity, besides being easy to share on social media . The books offer reader friendly features like searchable content, referencing, good readability, assured back up and retrieval. Also, young people preparing for exams, researchers , analysts etc don't have the time to wait for delivery of print books ; e- books therefore are a wonderful option .

The e-books are priced at Rs. 263 on leading E Commerce platforms Google Play Books and Flipkart, which may offer further discounts. They are easy to download – just go the web site of the e-retailer and search India Year book. The rest is an easy hand-holding experience. With the launch of the e-books, people can now access credible information about our country and programmes of the Govt from the most authentic source quickly and easily. The e- books are especially important for those remote areas where sales and delivery of print books is a cumbersome and lengthy process.

SOME IMPORTANT TITLES OF PUBLICATIONS DIVISION

1. The Economic History of India—Vol-One	175.00
2. The Economic History of India—Vol-Two	260.00
3. Babu Jagjivan Ram	132.00
4. Conscience of the Race—India's Off-beat Cinema	240.00
5. Indian Navy—a Perspective	300.00
6. Growing Fruits and Vegetables	240.00
7. Children in India—A Legal Perspective	75.00
8. Indian Railways—Glorious 150 years	250.00
9. Media Ethics	100.00
10. The Story of India's Struggle for Freedom	75.00
11. India In the Space Age	235.00
12. Folk Arts and Social Communication	125.00
13. Aspects of Indian Music	60.00
14. A Brief History of Water Resources in India	70.00
15. The Charkha and the Rose	75.00
16. Ramananda Chattopadhyay	75.00
17. R. N. Tagore	95.00
18. Some Eminent Indian Scientist	125.00
19. Subhas Chandra Bose	100.00
20. Khudiram Bose (Beng.)	75.00
21. Indian Civilisation and the Science of Fingerprinting	160.00
22. Story of INA	35.00

Available at :

SALES EMPORIUM :
8, Esplanade East ; Kolkata-700 069
Ph. : 2248-6696, 2248-8030

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 10.00

JUNE, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।

জুন, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যোগ — ড. ঈশ্বর ভি বাসবরেড্ডি — ৫
- আয়ুর্বেদের উদ্ভব ও বিকাশ — ডা. ডি সি কাটৌচ — ৯
- হোমিওপ্যাথি—স্নিগ্ধ শুশ্রূষা — ডা. রাজ কে মানচান্দা ও ডা. হারলীন কাউর — ১৪
- হাকিমি : স্বাস্থ্য ও আরোগ্য বিজ্ঞান — অধ্যাপক রাইস্-উর-রহমান — ১৮
- ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদ — ডা. অবিচল চট্টোপাধ্যায় — ২১
- পশ্চিমবঙ্গে 'আয়ুষ' চিকিৎসা পদ্ধতি — ডা. অখিলেশ খাঁ, ডা. কাজল ভট্টাচার্য ও ডা. পি বি কর মহাপাত্র — ২৪
- কৃষিতে অ্যান্টিবায়োটিক ও বিকল্প ভাবনা — ড. সগর মৈত্র — ৩২

এগিয়ে চলেছে ভারত

- সংস্কার : বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বিকাশের চাবিকাঠি — প্রভাকর সাহু ও অভিরূপ ভুঁইয়া — ৩৬
- শক্তিক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় উত্থান — কে আর সুধামন — ৪১
- অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশে কর্মসংস্থানের বিকাশ — দীপক রাজদান — ৪৫
- জন সুরক্ষা প্রকল্প : সুনিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তা — — ৪৮

বিশেষ নিবন্ধ

- জীববৈচিত্রের সুরক্ষা — অনিন্দ্য ভুক্ত — ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৫৩

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

চার্লস ডারউইনের 'বিবর্তন তত্ত্ব' অনুযায়ী অভিযোজন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর চাবিকাঠি। অর্থাৎ, বেঁচে থাকার লড়াইয়ে যে কোনও সবল জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনা কোনও দুর্বল প্রজাতির জীবের তুলনায় বেশি। এই চরম প্রতিযোগিতার মুখে বেঁচে থাকার তাগিদেই মানবজাতি যুগযুগান্তর ধরে নানা উদ্ভাবনী উপায়ে জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আধুনিকীকরণের প্রভাব এবং উপযোগিতা আজ আর উপেক্ষা করা যায় না। নিত্যনতুন উদ্ভাবনের সাহায্যে যোগাযোগ মাধ্যম ও যাতায়াত ব্যবস্থা এত দ্রুত হয়ে উঠেছে; চিকিৎসাক্ষেত্রে ঘটেছে অভাবনীয় অগ্রগতি। জীবনদায়ী এই পরিষেবাক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে বটে, তবে, সেই সঙ্গে প্রকৃতিতে অত্যধিক মানব-হস্তক্ষেপ এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা আরও কঠিন ও দুরারোগ্য রোগের প্রকোপের জন্য দায়ী। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক প্রযুক্তি এই জটিল পরিস্থিতির কোনও সুরাহা করতে পারেনি, পারেনি হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ আবার 'বিকল্প চিকিৎসাব্যবস্থা ও চিকিৎসাবিদ্যা'-র দিকে ফিরে যেতে চেয়েছে। এ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করে মানুষকে রোগমুক্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। মূলত এই নীতিই ভারতীয় প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি—শুধুমাত্র রোগ নিরাময় নয়, এর প্রধান উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা। আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, ন্যাচারোপ্যাথি, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা এই সব বিকল্প চিকিৎসাবিদ্যায় সুস্থ শরীর, সুস্থ মন এবং সামগ্রিকভাবে শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান হিসাবে আয়ুর্বেদ ও যোগের আবির্ভাব হয় পাঁচ হাজার বছরেরও আগে। দক্ষিণ ভারতে জনপ্রিয় প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিদ্ধা ; অন্যদিকে ইউনানির জন্ম হয় প্রাচীন গ্রিসে। জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থার আবিষ্কার করেন। এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা বছরের পর বছর ধরে মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে চলেছে। অবশ্য, এই সব বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে খুব সম্প্রতিই। এগুলি শুধুমাত্র কার্যকর, সস্তা ও পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াহীনই নয়, কিছু নির্দিষ্ট দুরারোগ্য ব্যাধি ও মুমূর্ষু রোগীদের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে উপকারী। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে যে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, সে রকম কিছু ক্ষেত্রেও এই সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে।

যোজনা

বিশ্ব জুড়ে নানা প্রতিষ্ঠান বিকল্প চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে। নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাতে বেশি উপকৃত হতে পারেন, সে জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদের মধ্যে এই সমস্ত বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে নীতি প্রণয়ন করতে সচেষ্ট। আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি (বা হাকিমি), সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবস্থায় গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতে একটি পুরোদস্তুর আলাদা মন্ত্রক স্থাপন করা হয়েছে। বিকল্প চিকিৎসাশাস্ত্র-সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন, ওষুধের গুণমান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর আয়ুষ মন্ত্রক বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়।

শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘও যোগের সার্বিক উপযোগিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে—২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই বছরই প্রথমবার ২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে। এই উপলক্ষে যোজনাও তার পাঠকদের সামনে এই সব বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত আদর্শ, এর ভালো-মন্দ, ইত্যাদি তুলে ধরেছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক বছর কেটে গেছে। বিগত এক বছরে নতুন সরকারের নেওয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র দূরীকরণ, আয় বৈষম্য হ্রাস আদি ভারতীয় অর্থনীতির ওপর সামগ্রিকভাবে কেমন প্রভাব ফেলেছে, সে সম্পর্কেও বিশদে পর্যালোচনা করা হয়েছে এই সংখ্যায়।

পরিশেষে বলা যেতেই পারে যে বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থা আদৌ 'বিকল্প' নয়, আসলে এই প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোই প্রচলিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বুনিয়াদ। তাই সকলেরই এগুলিকে জীবনযাত্রার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত সরকারি নীতি প্রণীত হলে প্রত্যেকটি ভারতীয় নাগরিকের জীবন হয়ে উঠবে নির্ঝঞ্ঝাট ও সুস্বাস্থ্যসমৃদ্ধ।❑

স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যোগ

যোগ শুধুমাত্র একটি ব্যায়াম পদ্ধতি নয়। যোগ হল আধ্যাত্মিকতা-ভিত্তিক এক বৈজ্ঞানিক শাস্ত্র যা সুস্বাস্থ্য অর্জন করতে বিশেষভাবে কার্যকর। রাষ্ট্রসংঘও যোগের সার্বিক উপযোগিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বায়িত আধুনিক যুগে এই সুপ্রাচীন শাস্ত্র কতটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে আলোচনা করছেন **ড. ঈশ্বর ভি বাসবরেড্ডি।**

যোগ বা যোগব্যায়াম হল এক ধরনের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা যা শরীর ও মনের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। সুস্থ সবল জীবনের জন্য যোগ হল একাধারে শিল্প ও বিজ্ঞান-নির্ভর শৃঙ্খলাবদ্ধ এক আচরণ। সাধারণ ও সামগ্রিকভাবে যোগের সুফল সুপরীক্ষিত ও সুপ্রমাণিত। রোগ মুক্তির একটি উপায় বা নীরোগ সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার আর এক নামই হল যোগ বা যোগব্যায়াম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্প্রীতি ও সমন্বয় রক্ষায় এর জুড়ি নেই। মানুষের জীবনশৈলীর সঙ্গে সম্পর্কিত বহু অসুখ-বিসুখ বা রোগ নিয়ন্ত্রণ করে যোগ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সংস্কৃত 'যুগ' শব্দটি থেকে 'যোগ'-এর উৎপত্তি। সংস্কৃতে এর অর্থ হল 'যুক্ত করা' বা 'মিলিত করা'। যোগ সম্পর্কে প্রাচীন পুঁথিপত্র বা গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে যোগাভ্যাসের ফলে মানুষের চেতনার সঙ্গে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চেতনার মিলন ঘটে যা শরীর ও মন তথা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে। যোগাভ্যাসের লক্ষ্য আত্মোপলব্ধি যা মানুষকে সব রকম দুঃখ, দুর্দশা, ব্যথা, যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে 'মুক্তি'-র (মোক্ষ) পথ দেখায়। অর্থাৎ 'বন্ধন মুক্তি'-র (কৈবল্য) একটি উপায় হল যোগাভ্যাস বা যোগসাধনা। যোগাভ্যাসের উদ্দেশ্য হল জীবনে চলার পথে 'বন্ধন মুক্তি'-র মধ্য দিয়ে সুস্বাস্থ্য ও উদ্বেগশূন্য মনের অধিকারী হওয়া। মানব সভ্যতার সূচনাকাল থেকেই যোগসাধনার সূত্রপাত বলেই সাধারণের বিশ্বাস। যোগাভ্যাস তথা যোগসাধনাকে সিন্ধু সভ্যতার এক 'অবিনশ্বর সাংস্কৃতিক ফসল' বলে মনে করা হয়, যার ইতিহাস সুপ্রাচীন—যা খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০ শতকের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের এক পরাকাষ্ঠাই হল যোগাভ্যাস।

যোগাভ্যাসের সূচনা ও ক্রম পরিণতি

যোগ হল একটি বিজ্ঞানসম্মত অভ্যাস বা আচরণ যার ইতিহাস হাজার হাজার বছর পূর্বের। এমনকী প্রথম ধর্মমত বা ধর্মবিশ্বাস উৎপত্তির বহু আগে থেকেই যোগাভ্যাসের শুরু। যোগ গাথা অনুযায়ী শিবই হলেন প্রথম যোগী তথা আদি যোগী। অর্থাৎ প্রথম গুরু তথা আদি গুরু। বেশ কয়েক বছর পূর্বে হিমালয়ের কান্তিসরোবরের তীরে আদিযোগী প্রবাদপুরুষ সপ্তঋষিকে তাঁর অগাধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছিলেন। ঋষিরা এই যোগ বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা-সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে। আশ্চর্যের বিষয় এ যুগের বিদগ্ধ মহল বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে সমান্তরাল ধারা ও মিল খুঁজে পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত বোধ করেছেন। তবে, ভারতেই যোগাভ্যাস তথা যোগসাধনা পূর্ণ বিকাশ ও ব্যাপ্তি লাভ করে। অগস্ত্য ছিলেন সপ্তঋষির অন্যতম। তিনি যোগনিষ্ঠ জীবন সাধনার মধ্যে এই সাংস্কৃতিক চেতনাকে মূর্ত করে গেছেন।

সিন্ধু-সরস্বতী উপত্যকা সভ্যতার যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যোগসাধনার নানা মুদ্রার খোদাই করা চিত্র খুঁজে পাওয়া গেছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে যোগসাধনা তথা যোগাভ্যাসের চল ছিল। যে সমস্ত প্রতীক এবং দেবী মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকে তন্ত্রযোগের অভ্যাস বা আচরণ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। লোকশিল্প তথা ঐতিহ্য সিন্ধু সরস্বতী উপত্যকা সভ্যতা, বেদ ও উপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ধারা ও ঐতিহ্য দর্শন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য, ভাগবদগীতা, শৈব ও বৈষ্ণবদের মত বা বিশ্বাস এবং তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে যোগাভ্যাস তথা যোগসাধনার সুপ্রাচীন অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বৈদিক যুগেরও আগে থেকে যোগাভ্যাসের চল ছিল একথা প্রমাণিত সত্য। তবে মহর্ষি পতঞ্জলিই যোগাভ্যাস ও যোগসাধনার বিষয়টিকে নির্দিষ্ট ছক বা পদ্ধতিতে নিয়ে এসে তার প্রকৃত অর্থ ও জ্ঞানের সন্ধান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বহু মুনিঋষি এবং যোগগুরু তাঁদের যোগসাধনার কলাকৌশল প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে এই সুপ্রাচীন ধারাটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। বর্তমান যুগে রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্যরক্ষা এবং স্বাস্থ্যোন্নতিতে যোগাভ্যাসের সুফল সম্পর্কে সকলেই মোটামুটি বিশ্বাসী ও আশাবাদী। বহু প্রজ্ঞাপুরুষ এবং যোগগুরুর ত্যাগ ও সাধনার মধ্য দিয়ে যোগসাধনা আজ বিশ্বের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

দর্শন, ঐতিহ্য, মত ও পথ এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরা যোগকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, ধ্যানযোগ, পতঞ্জলিযোগ, কুণ্ডলিনীযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, পয়যোগ, রাজযোগ, জৈনযোগ,

বৌদ্ধযোগ-সহ যোগসাধনা সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানধারণা জন্ম নিয়েছে। প্রতিটি ধারণাই নিজস্ব নীতি ও অভ্যাস বা অনুশীলনে বিশ্বাস করে। কিন্তু সব কটিরই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কিন্তু এক—যোগসাধনা।

ভারতকে বলা হয় যোগের পীঠস্থান। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার আচরণের এক 'উজ্জ্বল সহাবস্থান'। কিন্তু প্রতিটি রীতিনীতি ও আচার আচরণই পরস্পরকে সম্মান জানায় সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে, প্রকৃতি ও পরিবেশগত ভারসাম্যের প্রতি রয়েছে মিলিত প্রেম বা ভালোবাসা এবং সৃষ্ট জীব ও প্রাণীকুলের জন্য রয়েছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গি। সমস্ত যোগসাধনাকেই মনে করা হয় এক অর্থবহ জীবনধারণের একমাত্র অব্যর্থ উপায়। ব্যক্তিগত তথা সামাজিক পর্যায়ে এক সুস্থ সমন্বয়ের ফলে যে কোনও ধর্ম, বর্ণ বা জাতির কাছেই যোগাভ্যাস তথা যোগসাধনা আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

আনন্দের কথা যোগাভ্যাসের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনে সাফল্য লাভ করেছে। আর যোগসাধনার এই ধারা ও ধারণাকে পরম যত্নে ও সাদরে লালন করে এসেছেন বিশিষ্ট যোগ গুরুরা সেই কোন প্রাচীন আদিকাল থেকে।

সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধির জন্য যোগ

যে সমস্ত যোগসাধনা মানুষকে খুব বেশি করে আকৃষ্ট করেছে তার মধ্যে রয়েছে—ইয়ামা, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যহরা, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, মুদ্রা, সাতকর্ম, যুক্ত আচার, যুক্ত কর্ম, মন্ত্রজপ ইত্যাদি।

'ইয়ামা' মানুষকে সংযম শেখায়। অন্যদিকে 'নিয়ম' মানুষকে পালন বা মেনে চলার অভ্যাস রপ্ত করায়। যে কোনও ধরনের যোগসাধনার এ দুটি হল পূর্বশর্ত। দেহ-মনের স্থিরতা তথা সুস্থিতি নিশ্চিত করে 'আসন'। পৃথিবীব্যাপী যোগশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। যে কোনও ধরনের শারীরিক গঠনে যোগ পদ্ধতির প্রয়োগ সুফল এনে দেয়। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমীক্ষা ও গবেষণা এবং এ সম্পর্কিত সাহিত্যকীর্তির সংখ্যাও বর্তমান বিশ্বে কম নয়। তাই যোগ সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ আগ্রহ ও আকর্ষণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

প্রাণায়ামের বিষয়টি মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত চেতনাকে আরও উদ্বুদ্ধ করে। শ্বাস নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ব্যক্তি মানুষের জাগতিক অস্তিত্বের দিকটি। এই ভাবে শ্বাস নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে মানুষ তার মনকে চিনতে শেখে, তাকেও নিয়ন্ত্রণ বা সংযত করতে উৎসাহী হয়। সূচনায় নাসারন্ধ্র, মুখ এবং অন্যান্য শারীরিক প্রত্যঙ্গের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মানুষের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটে। পরে, নিয়ন্ত্রিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মধ্য দিয়ে মানুষ তার শারীরিক অভ্যাস তথা ক্রিয়াকর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়।

প্রত্যাহারের অর্থ ষষ্ঠেন্দ্রিয় থেকে মুক্তির চেতনা। এই ষষ্ঠেন্দ্রিয় বহির্জাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে মানুষের বন্ধন ঘটায়। অন্যদিকে ধারণা হল শরীর ও মনকে একমুখী করে তোলার উপায় যা মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে। ধ্যান হল একনিষ্ঠ চিত্তে একাগ্রতার সঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য আত্মমগ্ন হওয়ার এক সোপান। আর সমাধি হল একাত্মতা।

মুদ্রা হল প্রাণায়ামের সঙ্গে যুক্ত একটি অভ্যাস। উচ্চতর এবং উন্নততর যোগাভ্যাসের একটি অঙ্গ হল মুদ্রা যা যোগ সাধনার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে মানুষকে সাহায্য করে। সাতকর্মের মধ্য দিয়ে যাবতীয় শারীরিক বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ ত্যাগ করা হয়। তাই সাতকর্মের বিষয়টি সুস্থ জীবনযাত্রার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

সুস্থ শরীরে জীবিত থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্য ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস। এই চেতনা মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলে যুক্তহর। ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি এবং তার সাহায্যে জাগতিক অস্তিত্বের সীমানার বাইরে উত্তরণ ঘটানো যোগসাধনার মূল ও অভীষ্ট লক্ষ্য। তবে নিয়মিতভাবে প্রতিদিন আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ রোগমুক্ত সুস্থ জীবন লাভ করতে পারে।

যোগ ও জীবনশৈলী

মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিরই অন্য নাম জীবনশৈলী। ব্যক্তিমানুষের সুস্থ বা অসুস্থ থাকার সঙ্গে জীবনশৈলীর যোগ বড় নিবিড়। জীবনের প্রত্যুষলগ্নেই জীবনশৈলীর অভ্যাস গড়ে ওঠে। তাই শৈশবেই সুস্থ জীবনশৈলীর আশ্রয় গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি বা জীবনশৈলীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বেশ কয়েকটি বিষয়। অর্থনৈতিক অবস্থা তথা পরিস্থিতির মাপকাঠিতে আমরা বুঝতে পারি যে অপুষ্টির মূলে রয়েছে দারিদ্র আর দৈহিক স্থূলতার কারণ বিত্ত বা সম্পদের অত্যধিক জোগান। অন্যদিকে সমাজ বা সমষ্টির সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে জন্ম নেয় মানুষের খাদ্যের প্রতি রুচি বা খাদ্যাভ্যাস। হৃদযন্ত্রের ধমনির অসুখের মূলে রয়েছে ব্যক্তি মানুষের অলস জীবনযাপনের অভ্যাস। অন্যদিকে ধূমপান ও মদ্যপানের ফলে হৃদরোগ ও যকৃতের অসুখের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সুস্থ খাদ্যাভ্যাস সবল শারীরিক ক্রিয়াকর্ম, সুঅভ্যাস, বিশ্রাম ও বিনোদন হল সুস্থ জীবনশৈলীর পূর্বশর্ত।

এক উৎকৃষ্ট ও আদর্শ জীবনশৈলীর অন্য নাম যোগাভ্যাস তথা যোগসাধনা। কারণ যোগ হল এক সংহত ও সামগ্রিক জীবনবোধ। যোগাভ্যাস জীবনকে করে তোলে সুস্থ ও ইতিবাচক যা শারীরিক কষ্ট বা মানসিক টানাপোড়েনের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ভেতর জাগিয়ে তোলে অদম্য ইচ্ছা ও মনোবল। তাই যোগ হল এক ধরনের 'জীবন বিমা'। আর এই কারণেই এক গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত সত্য হিসেবে যোগ বর্তমান বিশ্বে ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

যোগাভ্যাসের নীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে 'যোগের মাধ্যমে রোগ নিরাময়' বা 'যোগ চিকিৎসা'র ধারণা। যোগাভ্যাসের মূলে রয়েছে মানসিক নিষ্ঠা ও মনের একাগ্রতা। গীতা, উপনিষদ, যোগসূত্র, হঠযোগ সহ প্রাচীন পুঁথিপত্র ও গ্রন্থে যোগকে শৃঙ্খলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা মানুষের মনকে মুক্ত হতে সাহায্য করে। মন হল জ্ঞান, চেতনা ও উপলব্ধির এক আধার বিশেষ।

যোগের মাধ্যমে মনের উত্তরণ ঘটে, সমস্ত রকম অস্বচ্ছতা দূর হয়, জীবন ও জগৎ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্বচ্ছতার আচরণ কেটে গিয়ে স্বচ্ছতার আলোকে মনের মুক্তিলাভ ঘটে। যোগসূত্র কিংবা অন্যান্য পুঁথিতে অসুস্থতার সঙ্গে যোগসাধনার নীতির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিষয়ের কোনও উল্লেখ নেই। কিন্তু 'ব্যাধি' অর্থাৎ অসুস্থতাকে (সুস্থ জীবনের) একটি অন্তরায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে হঠযোগ প্রদীপিকা, সংহিতা যোগ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, যোগ রহস্যসহ বিভিন্ন হঠযোগ গ্রন্থে রোগ মুক্তির পথ বা উপায় হিসাবে ক্রিয়া, আসন, প্রাণায়াম এবং মুদ্রার উল্লেখ রয়েছে। বহু বছর ধরে যোগাচার্য তথা যোগগুরুরা যোগ চিকিৎসা পদ্ধতি উদ্ভাবনে সচেষ্ট ছিলেন। পরের প্রজন্মকে তাঁরা তা দান করে গেছেন। 'যোগ চিকিৎসার ঐতিহ্য' নামেই তা পরিচিত, প্রচলিত এবং ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

যোগ চিকিৎসা কতকগুলি নীতি ও ধারণাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে—

- 'চিত্তবৃত্তিনিরোধ', 'ক্রিয়াযোগ' এবং 'অষ্টাঙ্গ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় পতঞ্জলির যোগসূত্রে।
- উপনিষদে রয়েছে 'পঞ্চকোষ'-এর অবতারণা।
- পতঞ্জলি যোগসূত্র এবং হঠযোগে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের 'শুদ্ধি' সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্য।
- বায়ু ও প্রাণের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করা (নাড়ি শুদ্ধি), স্থলপদ্ম ও চক্রের উন্মুক্তকরণ, প্রাণায়াম, মুদ্রা এবং দৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বের হদিশ রয়েছে হঠযোগ এবং কুণ্ডলিনীযোগে।
- পতঞ্জলি যোগসূত্র, মন্ত্রযোগ এবং হঠযোগের নীতি ও তত্ত্ব অনুসারে একাগ্র মনে কাজ করে যাওয়া সম্পর্কিত তথ্য ও ধারণা প্রচলিত রয়েছে বহু বছর ধরেই।
- ভাগবদগীতা অনুসরণ করে 'কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি'র সঙ্গে কাজ করে যাওয়ার নীতি ও আদর্শের সন্ধানও পাওয়া যায় বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে।
- বিভিন্ন যোগাভ্যাসের মধ্যে নিহিত রয়েছে তন্ত্রযোগের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে একটি বিকল্প স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে যোগ চিকিৎসা বর্তমানে প্রচলিত। যোগসাধনার সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যোগাভ্যাসের সুফলগুলির অন্যতম যে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ তা একটি পরীক্ষিত ও প্রমাণিত সত্য। রক্তচাপ কমাতে এবং হৃদরোগের বিভিন্ন ঝুঁকি এড়াতে যোগাভ্যাসের কার্যকারিতা সম্পর্কে বহু আলোচনা ও পর্যালোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে একথা সত্য। তবে যোগ চিকিৎসায় রক্তচাপের মাত্রা কতটা হ্রাস পাওয়া সম্ভব সে সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য বা তত্ত্ব খুব একটা পরিষ্কার নয়। যোগ চিকিৎসায় টাইপ-টু ডায়াবেটিসে আক্রান্ত বয়স্ক রোগীদের শরীরে শর্করার মাত্রা কমাতে সক্ষম বলে জানা গেছে। শরীরের ইনসুলিনের ক্ষমতা বৃদ্ধি, শর্করার প্রতি সহনশীলতা ইত্যাদিও যোগাভ্যাসের সুফল বলে বহু আলোচিত একটি বিষয়। এমনকী লিপিড প্রোফাইলও যোগ চিকিৎসার ফলে অনুকূল রাখা যায় বলে ধারণা প্রচলিত। এছাড়াও নানা ধরনের ক্রনিক ও জটিল রোগের মোকাবিলায় যোগ চিকিৎসা চমৎকার ফল দেয় বলে জানা গেছে। যোগাভ্যাস ও যোগ চিকিৎসার ফলে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের খুব বেশি ওষুধ নির্ভর হয়ে থাকতে হয় না বলে অনেকের বিশ্বাস। জীবনশৈলীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন রোগব্যাধির মোকাবিলায় যোগ চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে বহু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে চিকিৎসা ও গবেষণালব্ধ বহু প্রতিবেদনে যোগাভ্যাসের শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সুফলের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মূলত যোগাভ্যাস, যোগসাধনা এবং যোগসাধনার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের অভিজ্ঞতাপ্রসূত বিবরণকে লিপিবদ্ধ করে সংকলিত হয়েছে এই সমস্ত প্রতিবেদন।

যোগাভ্যাস/যোগসাধনা মানুষের শরীরে কীভাবে কাজ করে

যোগ দেহমনের সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে এক চিকিৎসা তথা অনুশীলন বিশেষ। যোগের ক্রিয়া কীভাবে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা এবার দেখা যেতে পারে।

(১) বিভিন্ন 'শুদ্ধিক্রিয়া'র মাধ্যমে শরীরে জমা হওয়া দূষিত পদার্থ বের করতে যোগ বিশেষভাবে কাজ করে। যোগের সূক্ষ্ম ব্যায়ামের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহমন ভারমুক্ত হয়ে এক ধরনের সুখানুভূতির সঞ্চার হয়। শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ সহজতর হয়ে ওঠে, ফলে নানা ধরনের সংক্রমণ রোধ করা যায়।

(২) যোগ নিয়ন্ত্রিত জীবনশৈলী এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের সমন্বয়ে শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং যা কিছু শরীরের পক্ষে প্রতিকূল ও ক্ষতিকারক তা দূর হয়ে মানুষের জীবনীশক্তি ও কর্মোদ্যমে জোয়ার আসে।

(৩) কোনওরকম কষ্ট বা চাপ ছাড়াই বিভিন্ন রকমের শারীরিক নাড়াচাড়ার ফলে সমস্ত শরীর হয় সুঠাম।

(৪) শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যোগ শ্বাসযন্ত্রের প্রভূত উন্নতি ঘটায়। ফলে মানুষের আবেগ ও উদ্যম বৃদ্ধি পায়। এই দুটি বিষয়ই আমাদের শ্বাস প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত।

(৫) অঙ্গ সঞ্চালনার সঙ্গে শ্বাসক্রিয়া মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যোগের ভাষ্য অনুসারে আমাদের দেহ 'অনাময় কোষ'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্যদিকে মনের সম্পর্ক রয়েছে 'মনোময় কোষ'-এর সঙ্গে। আর এই দুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান 'প্রাণায়াম কোষ'-এর। তাই শ্বাস-প্রশ্বাস মানসিক সম্প্রীতি ও সমন্বয় ঘটাতে সাহায্য করে।

(৬) যোগে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। ফলে আরব্ধ কাজ যাতে ভালোভাবে সম্পন্ন হয়, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি ও মনোযোগের অভাব হয় না। যোগের আর একটি সুফল হল শরীরের প্রতিটি অঙ্গে কর্মশক্তির জোগান। শরীরের বাইরে এবং ভেতরে শক্তি ও উদ্যম এক নতুন মাত্রা লাভ করে। তাই মনকে সর্বদাই অনুসরণ করে 'প্রাণ' বা প্রাণশক্তি।

(৭) যোগ দেহমনের অভ্যন্তরে স্থিরতা নিয়ে আসে। যোগ সাধনায় একাগ্রতার বিকাশ ঘটে আর তারই ফলশ্রুতিতে এই স্থিরতা মিলিত করে মানব শরীর ও

মানবমনকে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য সুনিশ্চিত করে যোগ। মানসিক ভারসাম্য সম্ভব করে তোলে দৈহিক ভারসাম্য। আবার দৈহিক ভারসাম্য সম্ভব করে তোলে মানসিক ভারসাম্যকে।

(৮) শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া কৌশলের সাহায্যে যোগ দেহ, মন ও আবেগকে চাপমুক্ত রাখে। ফলে কষ্ট সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায় এবং ঘরে বাইরের যে কোনও চাপ বা ঝুঁকির মোকাবিলা করা সহজতর হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যু যেখানে অনিবার্য, যোগের এই সুফলই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে মানুষকে আবার সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনে, বৃদ্ধি পায় জীবনের গুণমান।

(৯) বিভিন্ন যৌগিক তথা মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং জীবনের প্রতি সঠিক ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ফলে নীতি ও ঔচিত্যবোধের ক্ষেত্রে মানবমনের নবজাগরণ ঘটে। নিরাময়, আরোগ্য, সঞ্জীবন এবং পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে আস্থা আত্মবিশ্বাস এবং অন্তর্নিহিত শক্তি একান্তভাবে প্রয়োজন।

(১০) মানবশরীরের সমস্ত রকমের ক্রিয়াকে সচল ও স্বাভাবিক রাখতে যোগের অবদান অনস্বীকার্য। মন, স্নায়ু, প্রতিরোধ শক্তি ইত্যাদিকে উজ্জীবিত করে যোগক্রিয়া। ইতিবাচক স্বাস্থ্য রক্ষা করে যোগ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কোনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলে আমাদের দেহমনকে। জীবনে যে কোনও সময়েই এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে উপস্থিত হতে পারে। আধুনিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে যোগের এই অবদান অসামান্য। যোগসাধনার বিষয়টি ব্যয়বহুল নয়, তাই যে কোনও চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে যোগের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে রোগীর দেহবল তথা মনোবল বৃদ্ধি করা সহজতর হয়ে ওঠে।

যোগ ও আয়ুর্বেদ

যোগ ও আয়ুর্বেদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। দুটিই বৈদিক জ্ঞানভাণ্ডার প্রসূত এক বিশেষ ব্যবস্থা বা পদ্ধতি। সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণ এবং অপ, তেজ, মরুৎ, ক্ষিতি ও ব্যোম—এই পঞ্চভূত-এর নীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে বেদ ও আয়ুর্বেদ। শারীরিক ক্রিয়াকর্ম (দোষ, ধাতু, মল) এবং শরীরের ওপর খাদ্য ও ওষুধের প্রভাব (রস-বীর্য-বিপাক)-এর বিষয়টি যোগ ও আয়ুর্বেদ উভয়েরই প্রতিপাদ্য বিষয়। যোগ ও আয়ুর্বেদ পরস্পরের পরিপূরক এবং দুয়ে মিলে এক বিশেষ সামগ্রিক ব্যবস্থা তথা পদ্ধতি শরীর ও মনের ভারসাম্যের ওপরই যে মানুষের দৈহিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে তা প্রমাণিত যোগ ও আয়ুর্বেদের ভাষ্যে। ৭২ হাজার নাড়ি, সাতটি মূলচক্র, পঞ্চকোষ এবং কুণ্ডলিনী শক্তি সম্পর্কে ধারণা যোগ ও আয়ুর্বেদে মূলত একই। পুরোপুরি রোগমুক্তির লক্ষ্যে আয়ুর্বেদ যোগ ও যোগাভ্যাস অনুশীলনের পক্ষে চিকিৎসাক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে আসন প্রাণায়াম ও ধ্যানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারে ভেষজ লতা গুল্মের ব্যবহার, দেহ শোধন ক্রিয়া, উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এবং মন্ত্রোচ্চারণের নির্দেশ দেয় আয়ুর্বেদ। যোগ এবং আয়ুর্বেদ একইসঙ্গে দেহ, শ্বাস, ইন্দ্র, চিত্ত এবং উদ্যম—শরীরের এই গোপন রহস্য আমাদের কাছে উন্মুক্ত করে। উপযুক্ত খাদ্য, ভেষজ, পঞ্চকর্ম, যোগাসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে শরীরের মধ্যে যে পরিবর্তন প্রক্রিয়া চলে তা আমাদের সামনে প্রকাশ করে যোগ ও আয়ুর্বেদ। সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনশৈলীর সঙ্গে মিশে রয়েছে ওই কয়েকটি বিষয়। জীবনের চারটি অভীষ্ট লক্ষ্য—পুরুষার্থ চতুষ্টয়, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—তা পূরণের জন্য দেহ ও মন সুস্থ রাখা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এইভাবেই বৈদিক চিকিৎসা অর্থাৎ আয়ুর্বেদ এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন অর্থাৎ যোগাভ্যাস মানুষের আত্মোপলব্ধির লক্ষ্যে দেহ মনের সুস্বাস্থ্য ও সম্প্রীতির বিকাশ সম্ভব করে তোলে।

উপসংহার

বর্তমান বিশ্বে স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। ওষুধ ও চিকিৎসার খরচ এখন সাধারণ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নাগালের বাইরে। অন্যদিকে সমষ্টিগত জীবনে প্রয়োজন নিরাপদ, কার্যকর, ব্যয়সাশ্রয়ী এবং সুলভ স্বাস্থ্য পরিচর্যা। মানুষের দেহমনে সুপরিবর্তনের লক্ষ্যে যে জ্ঞান তথা প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতার প্রয়োজন তার সন্ধান পাওয়া যায় যোগ এবং প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে। শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশেই নয়, পাশ্চাত্যেও বিকল্প চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রসার ও ব্যবহার যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তাতে হয়তো বেশ কিছুটা বিস্ময়ের অবকাশ থাকে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার নিরিখে বিচার করলে, চিকিৎসার একটি বিশেষ উপায় বা পদ্ধতি হিসেবে হয়তো যোগকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ হবে না। কারণ এ সম্পর্কে গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষা এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছায়নি। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যেখানে স্বাস্থ্যব্যবস্থার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে সেই পাশ্চাত্যেও যোগ ও আয়ুর্বেদের ক্রম প্রসার ঘটছে। প্রাচীন দর্শন এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। আর একটি সম্ভাব্য কারণ হল আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধি। এই কারণেই হয়তো চিরাচরিত চিকিৎসাব্যবস্থার দিকে মানুষ ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে। এছাড়া আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম নয়। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন রোগ নির্ণয় চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এবং সেগুলির প্রয়োগ ও সাফল্য সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত। কিন্তু সেজন্য যে ব্যয়ভার বহন করতে হয় তা সাধারণের নাগালের বাইরে। তাই সামগ্রিকভাবে রোগমুক্তির লক্ষ্যে পরিপূরক চিকিৎসাব্যবস্থার দিকে মানুষের ঝোঁক ও আগ্রহ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে 'যোগ'ই হল সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত এক প্রাচীন ও চিরাচরিত স্বাস্থ্য পরিচর্যার দ্যোতক।❑

[লেখক আয়ুষ মন্ত্রকের আওতাধীন 'মোরারজি দেশাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব যোগা'-র নির্দেশক।

email : ibasavaraddi@yahoo.co.in]

আয়ুর্বেদের উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতের চিকিৎসাব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের হাল আজ যেমনই হোক না কেন, প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদের মতো উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল কিন্তু এ দেশেই। একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও কালক্রমে আধুনিকতার দাপটে আয়ুর্বেদ নিজের জন্মভূমিতেই গুরুত্ব হারায়। তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক আঙিনার পাশাপাশি ভারতেও আয়ুর্বেদের কদর ক্রমশ বাড়ছে। আয়ুর্বেদের বিকাশের হালহকিকত জানাচ্ছেন **ডা. ডি সি কাটৌচ।**

পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে আয়ুর্বেদের উৎস সেই বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান থেকেই মেলে। ৫০০০ বছর আগের অথর্ব বেদে আয়ুর্বেদের শিকড় প্রোথিত বলে ধরা হয়। আর আয়ুর্বেদ তাই পঞ্চম বেদ এবং জীবনের বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। শুরুতে আয়ুর্বেদের ধ্যানধারণা মুখে মুখে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে ছড়িয়ে যেত, এই বিদ্যার ধ্যানধারণার প্রথাবদ্ধ নথিকরণ মূল নীতিগুলি এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রয়োগের নজির ইত্যাদি পঞ্জীকৃত করা শুরু হয় দুটি প্রধান আকর গ্রন্থের মাধ্যমে, যার একটি চরক সংহিতা ও আরেকটি সুশ্রুত সংহিতা আর এই দুই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। আয়ুর্বেদের অন্যান্য আকর গ্রন্থগুলি প্রধানত চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতার উপরেই ভিত্তি করে রচিত এবং অনেক পরে লেখা, যেগুলিকে আমরা জানি অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গ হৃদ্যম নামে। আয়ুর্বেদে প্রধান দুটি ভাবাদর্শের ধারা প্রতিষ্ঠা লাভ করে মোটামুটি খ্রিস্টপূর্বাব্দ প্রথম শতকের শেষে। এর একটি, আত্রেয় সম্প্রদায় অর্থাৎ চিকিৎসকদের ভাবাদর্শ আর অন্যটি ধন্বন্তরী সম্প্রদায় অর্থাৎ শল্য চিকিৎসকদের ভাবাদর্শ। এর একটি রোগের চিকিৎসা সংক্রান্ত দিক নিয়ে কাজ করে আর অন্যটি শল্য চিকিৎসা সংক্রান্ত দিকে নজর দেয়। সেই সময় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিদ্যাকে আটটি শ্রেণিতে ভাগ করা হত। যেমন কায় চিকিৎসা (মেডিসিন), শল্য (অস্ত্রোপচার), শলক্য (চক্ষু ও নাসা-কর্ণ-গলা), কৌমার ভৃত্য (শিশু চিকিৎসা), অগড় তন্ত্র (বিষ বিদ্যা), ভূতবিদ্যা (সাইকায়াট্রি), রসায়ন (বার্ধক্য বিদ্যা), বাজিকরণ (উদ্দীপ্ত ও স্বাস্থ্যবান থাকার বিজ্ঞান)। আর এই আটটি ভাগ থেকেই স্বাস্থ্যবিদ্যা ব্যবস্থার নাম হয়েছিল অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ। চিকিৎসা শিক্ষার মৌলিক ধারণা ও বিষয়গুলিকে ধ্রুপদী গ্রন্থের দুটি ত্রিপদীতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল, যার একটি, চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা এবং অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ এই তিনটিকে নিয়ে বৃহৎ ত্রয়ী আর অন্যটি মাধব নিদান, শারঙ্গ ধর সংহিতা এবং ভাবপ্রকাশ এই তিনটিকে নিয়ে লঘু ত্রয়ী। আমাদের সৌভাগ্য যে আয়ুর্বেদের প্রধান প্রধান সব গ্রন্থ আজও পাওয়া যায় এবং এগুলি সবকটিই আয়ুর্বেদিক ঔষধির আইনি সংজ্ঞা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণে ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট ১৯৪০-এর প্রথম তফশিলের তালিকাভুক্ত।

আয়ুর্বেদের বিভিন্ন দিক কালে কালান্তরে উঠে এসেছে এবং সেগুলি যথাযথভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। আর সেজন্যই আয়ুর্বেদের বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষ বিষয় ও উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়েছে অন্যান্য চিকিৎসাব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি করেই। যেমন চরক সংহিতায় জীবনের দর্শন, স্বার্থ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন রোগের শাশ্বত চিকিৎসার ধারার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুশ্রুত সংহিতায় চোখ, কান, গলা, নাক ও দাঁতের বিভিন্ন রোগ নির্ণয় ও তার শল্য চিকিৎসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাশ্যপ সংহিতা মূলত শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে রচিত। মাধব নিদান রোগ নির্ণয় ও রোগ লক্ষণ সংক্রান্ত দিক এবং নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা সম্পর্কে রচিত, ভাবপ্রকাশ, রোগের নানা ধরনের চিকিৎসার পদ্ধতি এবং পথ্যের বর্ণনা সম্পর্কে বিশদভাবে লেখা এই ধারার শেষতম গ্রন্থ শারঙ্গধর সংহিতা ওষুধ প্রস্তুতি ও তার ভাগ বা মাত্রা নির্ণয়ের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছে। আয়ুর্বেদের তথ্যগত কাঠামো ও তার প্রয়োগ সংক্রান্ত দিকের উত্তরোত্তর পরিবর্ধন ও প্রথাবদ্ধ উপকরণ যোগ করা সম্ভব হয়েছে নিরন্তর উদ্ভাবন, অন্তর্ভুক্তি ও সময়ান্তরে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার মাধ্যমে। মূল পাঠের উত্তরকালে প্রদত্ত ভাষ্য নানা সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়গুলিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা এবং পাঠগত দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তি দূর করার জন্য সংযোজিত হয়েছে। বর্তমানে আয়ুর্বেদ মূল নীতিধারণা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক বেশি স্পষ্টতার এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, মূলত তার বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া নিরন্তর চালিয়ে যাওয়ার ফলেই।

আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে মানবদেহ হল এক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড যার পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদান আছে—পৃথিবী (ধরিত্রী), জল (নীর), অগ্নি (আগুন), বায়ু (বাতাস), আকাশ—আর একটি প্রধান সূক্ষ্ম উপাদান, যাকে বলা হয় চেতনা বা আত্মা তত্ত্ব, যা চেতনা বোধ ও জীবনের সূচক। এই মহাবিশ্ব (ব্রহ্মাণ্ড) ও তার ক্ষুদ্র সৃষ্টি (মানুষ) মানবদেহের মধ্যে সাদৃশ্য ও আন্তর্সম্পর্ক বর্তমান, যাকে বলা

হয় প্রকৃতির নিয়ম। দেহতন্ত্রের মধ্যে তার প্রাকৃতিক উপাদানগুলির বিভিন্ন অনুপাতে ক্রিয়াকলাপের ফলে যে কার্যগত অবস্থা সৃষ্টি হয় সেগুলি হল ত্রিদোষ অর্থাৎ বাত, পিত্ত ও কফ (তিনটি জৈব উপাদান)। আর এগুলি গতিশীল সাম্য অবস্থায় বিরাজ করলে সুস্বাস্থ্য বজায় থাকে আর এদের মধ্যে অসাম্য দেখা দিলে তখনই হয় রোগ। দেহতন্ত্রের কাঠামোগত সত্তাগুলিকে বলা হয় ধাতু। যেমন রস (দেহ রস), রক্ত (রক্তকণিকা), মাংস (মাংসপেশি), মেদ (চর্বি কোষকলা), অস্থি (হাড় ও সেই সংক্রান্ত কলা), মজ্জা (বোন ম্যারো) এবং শুক্র (প্রজননমুখী ক্ষরণ)। দেহতন্ত্রের মধ্যে সব বিপাকীয় ও জৈব রূপান্তর ঘটিত ক্রিয়াকলাপ অগ্নি (জৈব-আগুন) এবং স্রোতস (চ্যানেল বা প্রবাহিণী)।

আয়ুর্বেদে রোগ নির্ণয় ও তার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমান। নীতিগতভাবে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ের অর্থ হল রোগসৃষ্টিকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপলব্ধি এবং ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে রোগটির প্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তা অবগত হওয়া। এরপর দোষ, ধাতু ও মলের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অসুখের প্রক্রিয়াকে ভেঙে দিয়ে রোগ পূর্ব অবস্থাকে আক্রান্তকে ফিরিয়ে আনা হল চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেভাবেই তার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এক দ্বৈত নির্ণয় পদ্ধতি, একাধারে রোগের অনুসন্ধান আর অন্যদিকে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে অনুসন্ধান যাতে করে অসুখের প্রাবল্য ও রোগীর শক্তি দুই সম্পর্কেই ধারণা মেলে। চিকিৎসার প্রকার ও উপায় অসুখের প্রাক্ ও রোগবৃদ্ধিকারী শর্তগুলি কীভাবে এড়িয়ে চলা যায় সেই দিক থেকেই নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও আছে ওষুধপত্র ও রোগীর প্রতি আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে তার যত্ন নেওয়া, পঞ্চকর্ম পদ্ধতির সাহায্যে জৈব শোধন এবং উপযুক্ত সতর্কতা মেনে ও জীবনযাপনের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনে শুধু অসুখই নিয়ন্ত্রণে আনা নয়, স্বাস্থ্যকর অবস্থাকেও নিয়ন্ত্রণ করা। এইভাবে রোগী বিশেষের চিকিৎসায় নেওয়া বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আয়ুর্বেদে রোগ নিরাময়ের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা বৈশিষ্ট্য।

আয়ুর্বেদে সব পদার্থেরই উপযুক্ত মাত্রায় ও যুক্তিগত প্রয়োগে চিকিৎসাগত সম্ভাবনা রয়েছে। আয়ুর্বেদিক ওষুধের উপকরণগুলি প্রধানত উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ ও খনিজ উৎস থেকে আহৃত। সেগুলিকে নানা ভাবে প্রক্রিয়াকরণের পর বিভিন্ন মাত্রায় ব্যবহার করে ওষুধ তৈরি করা হয়। উপাদানের প্রকৃতি ও মাত্রার উপর নির্ভর করে আয়ুর্বেদিক ওষুধকে উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ-খনিজ এবং খনিজ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। খনিজ উপাদানে প্রস্তুত ওষুধগুলিকে সাধারণভাবে রসৌষধি বলা হয়ে থাকে যেগুলি শোধন, মারণ, অমৃতিকরণ প্রভৃতি বিশেষ কিছু প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত হয়ে থাকে। যাতে এগুলিকে চিকিৎসাগতভাবে নিরাপদ ও কার্যকর বলে ধরা যায়। ধ্রুপদী আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসংখ্য একক উপাদান বিশিষ্ট এবং প্রচুর সংখ্যক বহু উপাদান বিশিষ্ট ওষুধ রয়েছে যেগুলি নানা রকম ঔষধি উদ্ভিদ থেকে তৈরি আর আজও এগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে যেগুলি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সেগুলি মানকীকরণের পর আয়ুর্বেদের জাতীয় ঔষধি কোষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল অনুপান অর্থাৎ মধু, দুধ, উষ্ণ জল প্রভৃতি এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভেষজ কাল অর্থাৎ ওষুধ সেবন করার উপযুক্ত সময়। একদিকে যেমন অসুখের তীব্রতা ও অবস্থার ভিত্তিতে রোগীকে দেয় ওষুধের মাত্রা ও পরিমাণ ইত্যাদি স্থির করা হয়ে থাকে, অন্যদিকে, সুনির্দিষ্ট মাত্রায় ও বিশেষ অনুপানের সঙ্গে সুনির্দিষ্ট সময়ে ও ব্যবধানে প্রয়োগ করা ওষুধ আরও ভালোভাবে দেহে শোষিত হয় এবং জৈব প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হওয়ার পর অভিপ্রেত চিকিৎসা সংক্রান্ত ফলাফল প্রদান করতে পারে। রোগের আক্রমণ স্থান ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে এগারো ধরনের ওষুধ সেবনবিধির উল্লেখ করা হয়েছে। রোগ, রোগ লক্ষণ, পরিপাক, অবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে। আয়ুর্বেদ যদিও বিভিন্ন রোগের উপযুক্ত ওষুধ প্রদানে সক্ষম, তার বিশেষ শক্তির জায়গাটি হল দীর্ঘমেয়াদি ও ক্ষয়কারী অসুখগুলি আর বিপাক ক্রিয়া ও বয়োবৃদ্ধি সংক্রান্ত সমস্যার জন্য পঞ্চকর্ম ব্যবস্থা, পায়ু ও জনন সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে কেশর সূত্র এবং নিবারণমুখী ও স্বাস্থ্যবর্ধনকারী ব্যবস্থার জন্য প্রকৃতি নির্ভর ওষুধ বিশেষ মান্যতা পেয়েছে।

আয়ুর্বেদ সব সময়ের মানুষের সমর্থন ও অনুরাগ পেয়ে এসেছে আর স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত নানা প্রতিকূল সময়েও অস্তিত্ব বজায় রেখে যেতে পেরেছে। স্বাধীন ভারতে আয়ুর্বেদকে সরকারিভাবে স্বীকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে এবং তা এমন এক শাস্ত্রের মর্যাদা পেয়েছে যেটি যথেষ্টভাবে বিধিবদ্ধ, সুসংঘটিত এবং দেশের চিকিৎসা পরিষেবা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং অন্যান্য আয়ুষ চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়ক নীতিগুলি ক্রমশ পরিচিত হচ্ছে এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি ২০০০ এবং জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্যনীতি রূপায়ণ কাঠামো ও এই সব নীতির অন্তর্গত বিভিন্ন নীতি কৌশলের দ্বারা পুষ্ট হয়ে আয়ুর্বেদ ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। ১৯৯৫ সালে আয়ুষ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এবং ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও হোমিওপ্যাথির জন্য ২০০২-এ জাতীয় নীতি ঘোষণার পর আয়ুর্বেদের বিস্তার ও উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তার নিজস্ব ক্ষমতা ও পরিধি অনুসারে এই সংক্রান্ত নানা কর্মসূচি রূপায়ণও করা হয়েছে। আয়ুর্বেদ শাখার পরিকাঠামো, কার্যগত সক্ষমতা, পরিষেবা প্রদান এবং সমকালীন প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিকাশ লাভের জন্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত অনুকূল লিপি সমূহ এবং ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দ যেমন কার্যকর হয়েছে, ঠিক তেমনি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে গৃহীত বিশেষ প্রকল্প এবং বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণের শর্তগুলি পালিত হওয়ায় আয়ুর্বেদের উন্নয়নে তা অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। এই সব নীতি ও অন্যান্য অনুকূল সিদ্ধান্তের সুফল লক্ষ করা যায়। ক্রমবর্ধমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বিকাশ, আদর্শ মান ও গুণমান নিয়ন্ত্রণে প্রয়াস আয়ুর্বেদিক পরিষেবার বিস্তার ও সহজে সেগুলির কাছে পৌঁছানোর সুবিধা এবং আয়ুর্বেদ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি হল এই ধারার চিকিৎসার জোরের জায়গা। স্বাস্থ্য

সুরক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে আয়ুর্বেদের আওতা, চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প এবং আই ই সি কর্মসূচিতে একে শামিল করায় বিশেষ উপকার হয়েছে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা সমাধানের স্বীকৃতি বাড়তে থাকায় বিশেষ করে সংক্রামক নয় এমন রোগের প্রতিরোধ ও মোকাবিলায় আয়ুর্বেদের ভূমিকা এবং সার্বিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণে আয়ুর্বেদের গবেষণা ও বিকাশ কর্মসূচিতে সরকারি সহায়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তারই পরিণামে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার নজির ভিত্তিক সাফল্য উল্লেখনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ও অনুশীলন ইন্ডিয়ান মেডিসিন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭০-এর সংস্থান অনুযায়ী গঠিত বিধিবদ্ধ সংস্থা সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মেডিসিন-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। এই কাউন্সিল বা পর্ষদই দেশে আয়ুর্বেদিক শিক্ষা, পাঠক্রম এবং কলেজগুলিতে পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা জারি বা সংশোধন করা বা আদর্শমান বেঁধে দেওয়ার বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। বর্তমানে আয়ুর্বেদের স্নাতক স্তরের ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত কাঠামোর মধ্যে দাঁড়িয়ে। বি.এ.এম.এস. স্নাতক স্তরের পাঠক্রম সাড়ে পাঁচ বছরের এবং এর মধ্যে এক বছরের ইনটার্নশিপ ধরা আছে। এছাড়া বাইশটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিন বছরের স্নাতকোত্তর শিক্ষা স্বীকৃত কলেজগুলিতে চালু আছে। আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পিএইচডি কর্মসূচি চালু হয়েছে আর এছাড়াও প্রথা বহির্ভূত স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদের পাঠক্রমও চালানো হয়। ২০০৩-এ ইন্ডিয়ান মেডিসিন সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট সংশোধনের পর এখন আর কেন্দ্রীয় সরকারের আগাম অনুমতি ছাড়া দেশে আয়ুর্বেদিক শিক্ষার কোনও কলেজ বা পাঠক্রম চালু করা যাবে না। একইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারেরও সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মেডিসিনের পরামর্শক্রমে স্বীকৃত আয়ুর্বেদিক যোগ্যতার বিজ্ঞপ্তি জারি করার ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন মহলে চাহিদা বাড়তে থাকায় অ্যালোপ্যাথিক এবং বিদেশি চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণের জন্য আয়ুর্বেদের ব্রিজ কোর্স চালু করারও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আয়ুর্বেদিক ওষুধের প্রস্তুতি ও তার গুণমান নিয়ন্ত্রণ ১৯৪০-এর ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টের আওতায় ও তার নিয়ম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত।

আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারকদের রাজ্য সরকার নিযুক্ত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ এবং উত্তম প্রস্তুত প্রক্রিয়ার সার্টিফিকেট নেওয়া আবশ্যক। আয়ুর্বেদিক উৎপাদনের গুণমান সুনিশ্চিত করার জন্য ইদানীং যেসব নিয়ন্ত্রণমূলক সংশোধন আনা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণির ওষুধের লাইসেন্সিংয়ের জন্য নীতি নির্দেশিকার ব্যাপারে বিজ্ঞপ্তি জারি করা, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের নাম, উপাদানের আকার এবং ওষুধে ব্যবহৃত উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ করা, ওষুধের মোড়কে তার মেয়াদ বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার তারিখ উল্লেখ করা, ওষুধের প্রস্তুতিতে কোনও সংরক্ষণকারী পদার্থ বা ওই জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয়েছে কি না তার উল্লেখ করা এবং সনাতনি আয়ুর্বেদীয় ওষুধের নামের আগে বা পরে উপসর্গ বা অনুসর্গ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রভৃতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ভারতে বহুধা বিভক্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার যে অনন্য নজির রয়েছে, তাতে একদিকে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা আর অন্যদিকে আয়ুর্বেদ-সহ ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও হোমিওপ্যাথি পুরোমাত্রায় চালু। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, জনসংখ্যাগত রূপান্তর এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রা ও সেই সঙ্গে উচ্চহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্পদের অভাব ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থাকে অনেক জটিল ও প্রতিকূল স্পর্ধী করে তুলেছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত লক্ষ্য পূরণ এবং সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের দু'মুখো চাপ সামলানোর সাপেক্ষে। এই প্রেক্ষাপটে আয়ুর্বেদ নিবারণ মূলক এবং স্বার্থ উন্নয়নমূলক পরিষেবা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যগত দীর্ঘদিনের বা ক্রমিক সমস্যার মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। ধীরে ধীরে যে পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার মধ্যে দেশে আপাতত তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার চারশো নথিভুক্ত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক রয়েছেন। রয়েছে পনেরো হাজার একশো তিপ্পান্নটি চিকিৎসালয়, দু'হাজার আটশো আটত্রিশটি রাষ্ট্রায়ত্ত হাসপাতাল, বছরে ১৩১৫২ জন ছাত্র ভর্তির ক্ষমতা-সহ ২৬০টি স্নাতক স্তরের কলেজ।

এছাড়াও আছে প্রায় ২৫০০ ছাত্রের শিক্ষাদানের ক্ষমতাসহ একশোটি স্নাতকোত্তর শিক্ষাকেন্দ্র এবং ৭৮৩৫টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাও। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়গত স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জেলা হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে একই সঙ্গে আয়ুষ ব্যবস্থাকে যুক্ত করায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পাওয়ার সুবিধাটা এখন অনেকটা বেড়ে গেছে। আর এটা মূলত ঘটেছে গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের সঙ্গে আয়ুষকে জুড়ে দেওয়ায়। এই কৌশল গ্রহণের ফলে দেশে এখন প্রায় ১৮১২৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়ুষ পরিষেবা এবং মূলত আয়ুর্বেদ পরিষেবা পাওয়া যায়। এছাড়াও আয়ুর্বেদের বিকাশে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গড়া হয়েছে ভারতীয় ওষুধ ব্যবস্থা ও হোমিওপ্যাথির ফার্মাকোপিয়া কমিশন, ফার্মাকোপিয়া কমিটি, জাতীয় স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আয়ুর্বেদ গবেষণা পর্ষদ, ভারতীয় ওষুধ ব্যবস্থার ফার্মাকোপিয়া সংক্রান্ত ব্যবস্থাগার এবং রাষ্ট্রীয় গবেষণাগার। নতুন দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট ফর আয়ুর্বেদ স্থাপনের ফলে গবেষণা ও বিকাশগত সুবিধার আন্তর্শাখাগত শিক্ষার সুবিধা অনেক বাড়বে। আর সমকালীন প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে আয়ুর্বেদ মতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমাধান আরও বেশি করে পাওয়ার পথ প্রশস্ত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৬৩৫টি ওষুধের আয়ুর্বেদিক সূত্র প্রকাশ এবং আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়ার বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশের ফলে একটি ঔষধি সংবলিত উৎপাদনের গুণমান সংক্রান্ত আদর্শ স্থির করার ক্ষেত্রে প্রায় ছশোটি মনোগ্রাফ এবং নানা উপাদানে সমৃদ্ধ ওষুধের ক্ষেত্রে ১৫২টি মনোগ্রাফ সম্ভব হয়েছে, যা একদিকে আয়ুর্বেদিক ওষুধের গুণমান বাড়াতে আর

অন্যদিকে তার প্রস্তুতিতে আদর্শ মানক ব্যবস্থার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

আয়ুর্বেদ এবং অন্যান্য আয়ুষ ব্যবস্থার চিকিৎসাপদ্ধতিকে শামিল করে নিয়ে উন্নয়নের জন্য গৃহীত কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রীয় অর্থপুষ্ট নানা প্রকল্প রূপায়ণের ফলে উত্তম গুণমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান, উত্তম মানের ওষুধ পাওয়া এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধের গবেষণা ও তার প্রস্তুতিতে পেশাগতভাবে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার অত্যন্ত সুবিধা হয়েছে। অন্যান্য সরকারি সংগঠন যেমন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা দফতর, স্বাস্থ্য গবেষণা দফতর, জৈব প্রযুক্তি দফতর, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা পর্ষদ (সি.এস.আই.আর.) এবং ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পর্ষদ (আই.সি.এম.আর.) ইত্যাদি সংস্থায় গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারাও আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের প্রচার ঘটেছে। এই সব প্রচেষ্টার ফলে আয়ুর্বেদের বৈজ্ঞানিক দিকটা এখন আরও বেশিমাত্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠছে আর নজিরভিত্তিক পারদর্শিতা, সুরক্ষা ও গুণমানের ব্যাপারগুলি সুনিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। উদ্ভাবনমূলক আয়ুর্বেদিক প্রযুক্তি, সরঞ্জাম ও ওষুধ সংক্রান্ত উৎপাদনে শামিল আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব পেটেন্ট বিধির সংস্থান দ্বারা সুরক্ষাপ্রাপ্ত। যদিও প্রাচীন কলা ও ঐতিহ্যমূলক জ্ঞানের পেটেন্ট পাওয়া বেশ কঠিন।

আয়ুর্বেদের গবেষণা ও বিকাশ মূলত আয়ুর্বেদিক বিজ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রীয় পর্ষদের আওতাধীন আর সারা দেশে তিরিশটি ক্ষেত্রীয় কেন্দ্র আছে। পর্ষদের কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণা, ওষুধ সংক্রান্ত গবেষণা, ওষুধ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গবেষণা, ঔষধি উদ্ভিদের সমীক্ষা ও নথিভুক্তিকরণ, আয়ুর্বেদিক উদ্ভিদ ও চিকিৎসা পদ্ধতির নিরাপত্তা ও দক্ষতার নামকীকরণ এবং বৈধতা প্রদান ইত্যাদি। পর্ষদ ইতোমধ্যেই সতেরোটি বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ছাব্বিশটি ওষুধের বৈধতা প্রদান সম্পন্ন করেছে। ৭০৪টি উপজাতীয় লোককথা এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য পরম্পরা বিষয়ক দাবির নথিভুক্তিকরণ করা হয়েছে। আরও দশটি অসুখের পঁয়ত্রিশটি ওষুধের বৈধতা সমীক্ষার কাজ চলছে আর চৌষট্টিটি ওষুধের জন্য বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যও নেওয়া হয়েছে।

আয়ুর্বেদ রিসার্চ কাউন্সিল এবং অন্যান্য গবেষণা ও বিকাশ প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষাকারীদের উদ্ভাবিত ওষুধের বাণিজ্যিক প্রয়োগের জন্য পেটেন্টও প্রদান করা হয়েছে। কাউন্সিলকে সতেরোটি পেটেন্ট দেওয়া হয়েছে আর চোদ্দোটি পেটেন্টের আবেদনপত্র পেশ করা হয়েছে। এছাড়া দশটি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তর ছাড়া হয়ে গেছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জামের জৈব যন্ত্রায়ণ উদ্যোক্তাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর জন্য আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের অগ্রণী প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে এই ধরনের উদ্যোগের ফলে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের গবেষণার পরিবেশ এখন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় আয়ুর্বেদিক রিসার্চ কাউন্সিল একাই প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৈজ্ঞানিক পত্র প্রকাশ করেছে এবং আয়ুষ গবেষণা ওয়েব পোর্টালে ২৩০৬৫টি গবেষণা সংক্রান্ত নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। একটি অসরকারি সংস্থা ডিজিটাল অফলাইন অব আয়ুর্বেদিক রিসার্চ আর্টিক্যালস (ডি.এইচ.এ.আর.এ.-ধারা) নামে যে ওয়েব পোর্টাল চালু করেছে সেখানে প্রায় চুয়ান্ন হাজার গবেষণাভিত্তিক নিবন্ধ রয়েছে যার মধ্যে সাত হাজার তিনশো ছত্রিশটি শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পর্যালোচনা-কৃত।

ভারতীয় ওষুধ ব্যবস্থা ও হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত জাতীয় নীতি ২০০২ সালে গৃহীত হয়েছিল। এই নীতিতে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ব্যবস্থায় ভারতীয় ওষুধ ব্যবস্থার অর্থবহ ও পর্যায়ভিত্তিক আত্তীকরণের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গেই স্বাস্থ্য ও মানব উন্নয়নের স্বার্থে সব ধরনের চিকিৎসা পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গকরণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলা হয়েছিল। সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রককে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদা মেটানোর জন্য আয়ুষের উন্নয়নে সাতটি ভুমিকাগত অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছিল। আয়ুর্বেদ-সহ এই সব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি হল স্বাস্থ্য পরিষেবা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা, ওষুধ প্রয়োগ ইত্যাদি, তথ্য-শিক্ষা-যোগাযোগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ঔষধি উদ্ভিদের বিকাশ। সংশ্লিষ্ট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী প্রয়োজনভিত্তিক পরিকল্পনা এবং প্রকল্প রূপায়ণের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাই কিন্তু আয়ুষের প্রসার ও তাকে শক্তিশালী করা ও চাহিদা অনুসারে তার উন্নয়ন ঘটানোর জন্য দায়ী। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে মানুষের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্য সুরক্ষা চাহিদা মেটানোর চ্যালেঞ্জের সাপেক্ষে আয়ুর্বেদ মনে হয় সামাজিকভাবে গ্রাহ্য কালোত্তীর্ণ ও সংগ্রহ সাধ্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রযুক্তি জোগাতে সক্ষম হবে বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক আয়ুষ চিকিৎসাব্যবস্থাকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান ব্যবস্থার মধ্যে কার্যকরভাবে নিয়ে আসার প্রয়োজনটা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠে।

বিশ্বজুড়ে বাড়তে থাকা চাহিদা এবং সনাতনি ওষুধ এবং পরিপূরক ও গল্প ও সুদের দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক মঞ্চ গড়ে ওঠাটা আয়ুর্বেদকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিকাশের জন্য প্রয়াস গ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। এই উদ্দেশ্য সাধনে আয়ুষ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় এক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার সাহায্যে আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকদের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থা, নিয়মিত পাঠক্রমে বিদেশি ছাত্রদের ভর্তির জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, শিল্প মেলা, রোড শো ইত্যাদিতে আয়ুর্বেদীয় ওষুধ শিল্পের অংশগ্রহণ এবং বিদেশি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ দ্বারা ওই সব বাজারে স্বীকৃতি লাভের জন্য উৎপাদনগুলির নথিভুক্তিকরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা এই প্রকল্পে করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির সাহায্যেই মালয়েশিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, কিউবা, রাশিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশে ভারতীয় দূতাবাসে আয়ুষ ইনফরমেশন (তথ্য) সেল গড়ে তোলা হয়েছে। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষ

থেকে ভারতীয় ওষুধ ব্যবস্থা ও হোমিওপ্যাথি পাঠক্রমে পড়াশোনার সুযোগ পেতে ১১৫ জন বিদেশি ছাত্র বৃত্তি গ্রহণ করেছেন। ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং হাঙ্গেরির ডেব্রেসেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদিক অধ্যাপকের পদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইভাবে স্লোভেনিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় আয়ুর্বেদিক অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি বিবেচনাধীন। মালয়েশিয়া, ত্রিনিদাদ, টোবাগো, হাঙ্গেরি, বাংলাদেশ, নেপাল ও মরিশাস এবং আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে আয়ুর্বেদসহ সনাতনি ওষুধ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিকাশে সমঝোতাপত্র ইতোমধ্যেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে সনাতনি ওষুধের ক্ষেত্রে যে সমঝোতা হয়েছে, সেই অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নিজেই ২০১০ সালে দুটি আয়ুর্বেদিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। জামনগরের ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিং অ্যান্ড রিসার্চ ইন আয়ুর্বেদ প্রতিষ্ঠানটিকে ২০১৩-এর এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সহযোগিতামূলক কেন্দ্রের আখ্যাদান করা হয়।

বিশ্বজুড়ে আয়ুর্বেদের মূল্যায়ন ও তার বিকাশে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আয়ুর্বেদ যদিও ইতোমধ্যেই বহু দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে এর উপযোগিতা, গুণমান ও নিরাপত্তার বিষয়ে উপলব্ধিগত উদাসীনতার জন্য সমস্যা রয়েছে। বেশিরভাগ দেশেই আয়ুর্বেদকে চিকিৎসাব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি আর তাই এর ভূমিকাও এই চিকিৎসার অনুশীলন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সমস্যার মুখে। এই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার ঘটানো সরকারের উদ্দেশ্য এবং একই সঙ্গে বিশ্বের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আয়ুর্বেদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানও সরকারের লক্ষ্য।

আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আজ এমন একটা জায়গায় এই চিকিৎসাশাস্ত্রকে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে আমরা একে জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদানের উপযোগী বলে পেশ করতে পারি। তবে সুরক্ষা, দক্ষতা এবং গুণমানের প্রমাণ এমনই মাত্রায় হওয়া উচিত যাতে উৎপাদন ও পরিষেবা আন্তর্জাতিক বাজারের মানের উপযোগী হতে পারে। এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা হল আয়ুর্বেদিক ওষুধের ফার্মাকোডাইনামিক্স এবং প্রাপ্তি যোগ্যতা যে অন্যান্য ওষুধ সংক্রান্ত উৎপাদনের মতোই এবং সেভাবেই তাদের সহজে রফতানি করা যায় তা প্রমাণ করা। চিকিৎসা সংক্রান্ত সাফল্যের দাবিগুলির বৈজ্ঞানিক বৈধতা প্রমাণ, আদর্শ মানের চিকিৎসাব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আয়ুর্বেদের সনাতনি জ্ঞানকে অপহরণ ও লুণ্ঠনের শিকার না হতে দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে সুনিশ্চিত করা দরকার যাতে আয়ুর্বেদের গুরুত্ব থাকে সমধিক এবং তার স্বীকৃতিও হয়ে ওঠে সর্বজনগ্রাহ্য।❑

[লেখক আয়ুষ মন্ত্রকের আয়ুর্বেদ বিষয়ক উপদেষ্টা।
email : dckatoch@rediffmail.com]

উল্লেখপঞ্জি :

www.indianmedicine.nic.in–Ministry of AYUSH, Govt. of India
www.mohfw.nic.in–Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
www.nrhm-mis.nic.in–National Rural Health Mission (NRHM), Govt. of India
www.nia.nic.in–National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan
www.ravdelhi.nic.in–Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi
www.ayurveduniversity.edu.in–Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar, Gujarat
www.bhu.ac.in–Banaras Hindu University, Faculty of Ayurveda, Varanasi (U.P), India
www.ccimindia.org–Central Council for Indian Medicine, New Delhi
www.ccras.nic.in–Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi
www.plimism.nic.in–Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad
www.nmpb.nic.in–National Medicinal Plants Board, New Delhi
www.ayushportal.ap.nic.in–AYUSH Research Portal

হোমিওপ্যাথি—স্নিগ্ধ শুশ্রূষা

অ্যালোপ্যাথির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথি আজ এক শান্ত, সার্বিক, বিজ্ঞানস্বীকৃত বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই নিরাময় পদ্ধতির জনপ্রিয়তা ক্রমশই বাড়ছে। এর প্রেক্ষাপট, নীতি, অবস্থান, পরিধি, সুবিধা আর এ সংক্রান্ত গবেষণায় সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে উঠেছে **ডা. রাজ কে মানচান্দা** ও **ডা. হারলীন কাউর**-*এর লেখা নিবন্ধে।*

প্রেক্ষাপট

চিকিৎসা বিজ্ঞানের রূপান্তর ঘটছে দ্রুতগতিতে। উদ্ভাবনী নানা পরিকল্পনা 'আধুনিক' বিজ্ঞানকে প্রথাগত ঐতিহ্যের কাছাকাছি আনছে। চিকিৎসার সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও জীবনভিত্তিক অনুসন্ধান আজ শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, অপরিহার্যও বটে। মানুষের স্বাস্থ্য এবং রোগের কারণ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যকে প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি এতদিন যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে আসছে, এখন তার পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

হোমিওপ্যাথি স্বাস্থ্য পরিষেবার এমন এক পদ্ধতি, যেখানে প্রতিটি মানুষকে স্নিগ্ধতার সঙ্গে, সার্বিকভাবে, পাকাপাকি নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিচর্যা করা হয়। দুশো বছরেরও বেশি সময় ধরে এর ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নিরাময় পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। অষ্টাদশ শতকে গোঁড়া চিকিৎসা পদ্ধতির নির্মম প্রথাকে অগ্রাহ্য করে এর জন্ম। একজন বিশিষ্ট জার্মান চিকিৎসক ডা. হ্যানিম্যান দেখেন, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি শোষণ, রক্তপাত ও অন্যান্য নির্মমতার মধ্যে দিয়ে মানুষের দুঃখ ও যন্ত্রণা আরও বাড়িয়ে তুলছে। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে হ্যানিম্যান কেমিস্ট ও অনুবাদক হিসাবে কাজ করতে শুরু করেন। কিন্তু রোগীদের অসহায়তা তাঁকে স্থির থাকতে দিচ্ছিল না। এই সময়েই একদিন হ্যানিম্যান কুলেনের 'মেটিরিয়া মেডিকা'-র অনুবাদ করতে গিয়ে একটি অধ্যায়ে পড়লেন, সিঙ্কোনা গাছের ছালে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে পাওয়া ধারণা ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মত এক ব্যবস্থা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল হোমিওপ্যাথি। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বহু আগে ঊনবিংশ শতকে রোগগ্রস্ত মানসিকতার মানুষজনকে মন ভোলানোর জন্য ওষুধ হোমিওপ্যাথিতেই প্রথম প্রয়োগ করা হয়।

নীতিসমূহ

হোমিওপ্যাথি প্রধানত দুটি মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে। প্রথম নীতিটি হল similiasimilibuscurentur। এর অর্থ, কোনও ওষুধ রোগের মতো ব্যবহার করে দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। আরেকটি নীতি হল, দেহের নিজস্ব প্রতিরোধ শক্তির ওপর আস্থা। শরীর জানে সে কী করছে, তাই রোগের মোকাবিলার প্রয়াস শুরু হবে দেহের অভ্যন্তর থেকেই।

তৃতীয় নীতিটি হল, 'দ্য মিনিমাম ডোজ'। অর্থাৎ ওষুধ ততটুকুই প্রয়োগ করা হবে, যতটা দেহের প্রতিরোধ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে দরকার। এই জন্যই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সাধারণত ন্যূনতম ডোজে দেওয়া হয়। তাই অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মতো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ভয় এতে থাকে না।

এছাড়া আরও কয়েকটি নীতি হোমিওপ্যাথির মূল ভিত্তির মতো। সহজতার নীতি, অর্থাৎ একটিমাত্র অযৌগ ওষুধের প্রয়োগ। দীর্ঘদিনের রোগের নীতি, যা এই ধরনের রোগ মোকাবিলার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। ওষুধ পরিবর্তনশীলতার নীতি, যেখানে ওষুধকে হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতিতে রূপান্তরের কথা বলা হয়। ওষুধ প্রামাণ্য নীতি, যা মানুষের শরীরের ওপর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে।

হোমিওপ্যাথির অবস্থা

বিশ্বজুড়ে হোমিওপ্যাথির চর্চা হয়। প্রামাণ্য গবেষণার অগ্রগতি এবং এর অন্তর্নিহিত গুণের সুবাদে সাম্প্রতিককালে এর জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়েছে। সাধারণ জৈবচিকিৎসায় আটকে না থেকে সার্বিক ও ব্যক্তিনির্ভর মনোযোগ দেয়, এমন চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতি মানুষের ঝোঁকও এখন অনেকটা বেড়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপশি ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের মতো ইউরোপীয় দেশগুলিতেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে। এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ভারত। এখানে সর্বাধিক, আড়াই লক্ষেরও বেশি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আছেন। ব্যবহারকারীর সংখ্যা অগণ্য।

হোমিওপ্যাথির এই বিপুল চাহিদা দেখে সরকার এর সুযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত ও কারিগরি সহায়তা দিয়েছে। এরই ফলস্বরূপ ভারতে ১৮৭টির মতো স্নাতকস্তরের এবং ৪২টি স্নাতকোত্তর স্তরের হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এখান থেকে যে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকরা বেরোন,

B.H.M.S. ডিগ্রি পাবার আগে তাঁদের সাড়ে পাঁচ বছরের কঠোর প্রশিক্ষণ নিতে হয়। হোমিওপ্যাথিতে উচ্চশিক্ষার জন্য MD এবং PhD পাঠক্রমের ব্যবস্থাও রয়েছে।

ভারতে রাজ্য সরকার ও পুরসভাগুলির পরিচালনায় ২১৫টি হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল এবং ৬৮১২টি চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পে ৩৫টি, শ্রম মন্ত্রকের পরিচালনায় ৩৯টি এবং রেল মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে ১২৯টি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্র রয়েছে। তাপবিদ্যুৎ নিগম, জাতীয় অ্যালুমিনিয়াম নিগম, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশ বাহিনী, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিতেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুবিধা রয়েছে সদস্যদের জন্য। তবে ভারতে অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকই নিজস্ব ক্লিনিকে রোগী দেখেন। এগুলির থেকে পাওয়া সুবিধা ও ব্যয় নানা ধরনের হয়। কয়েকটি অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া দেশে হোমিওপ্যাথিক কলেজ ও হাসপাতালগুলি স্বশাসিতভাবে চলে। এখানে রোগীদের জন্য বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ রয়েছে। আছে রেডিওলজি ও প্যাথোলজি পরিষেবাও। নীচের ছবিতে দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কাঠামো দেখানো হল।

পরিধি ও সুবিধা

ব্যক্তিনির্ভর ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন চিকিৎসার জন্য মানুষজন হোমিওপ্যাথির প্রতি আকর্ষিত হন। হোমিওপ্যাথি ওষুধ কড়া নয়, সহজে খাওয়া যায় এবং এর দাম কম হওয়ায় দরিদ্ররাও এর সুবিধা ভোগ করতে পারেন। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, হোমিওপ্যাথিতে রোগীর মাথাপিছু খরচ, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতির পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলেই হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে পারে। প্রতিটি হোমিওপ্যাথি ওষুধই পরীক্ষিত, তাই মানুষের শরীরের পক্ষে নিরাপদ। মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ায়, সিংহভাগ হোমিওপ্যাথি ওষুধেরই পেটেন্ট নেওয়া হয়নি।

এক দশকের পাওয়া তথ্য (২০০১-১১) বিশ্লেষণ করে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, দিল্লি সরকার পরিচালিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে রোগীর সংখ্যা ৫৮ শতাংশ বেড়েছে। ত্বক, শ্বাসকষ্ট, সংক্রমণ, স্ত্রীরোগ ও হজমের গোলমালে ভোগা রোগী এবং দীর্ঘদিন ধরে কোনও অসুখে কষ্ট পাচ্ছেন, এমন রোগীরা হোমিওপ্যাথদের কাছে বেশি আসেন। এদের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যা খুব বেশি। আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ হোমিওপ্যাথি রোগী ২৫ থেকে ৪৪ বছর বয়সসীমার মধ্যে। তাঁদের আয় গড় আয়ের থেকে বেশি। উচ্চশিক্ষিত হওয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে সচেতনভাবে তুলনা করেই তাঁরা হোমিওপ্যাথিকে বেছে নিয়েছেন।

তবে এটাও সত্যি যে, অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির মতো হোমিওপ্যাথিরও কিছু নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে, জটিল প্রত্যঙ্গগত পরিবর্তনে, ওষুধের অপব্যবহারে হওয়া দীর্ঘদিনের রোগে, কোনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গেলে অথবা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে হোমিওপ্যাথি সেভাবে কাজ করতে পারে না। আবার HIV, ক্যানসার, মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগী অর্থাৎ যাঁদের দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিঃশেষিত, তাঁদের ক্ষেত্রেও হোমিওপ্যাথির উপযোগিতা সীমিত।

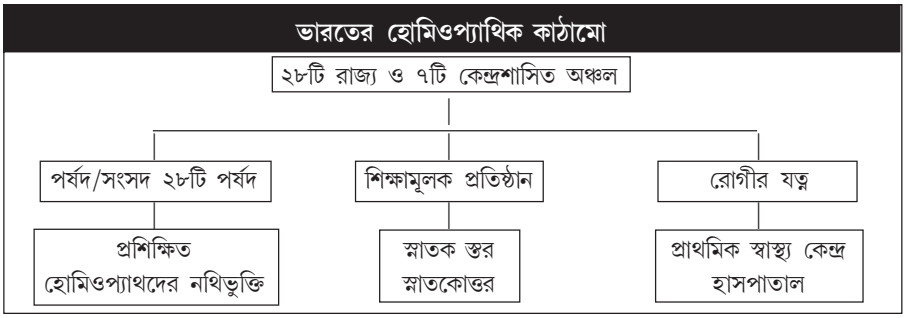

ক্রসপ্যাথি, অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা নিজেদের অনুসৃত চিকিৎসা পদ্ধতির বাইরে অন্য চিকিৎসা পদ্ধতির ওষুধও খেতে বলেন, তার ভালো-মন্দ দুদিকই আছে। প্রচলিত জৈব চিকিৎসা পদ্ধতির কোনও চিকিৎসক যদি কোনও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে বলেন, তখন হোমিওপ্যাথির বিশ্বাসযোগ্যতা আরও বাড়ে। আবার অন্যদিকে, ওই রোগী কোনও প্রশিক্ষিত হোমিওপ্যাথের কাছে গেলে যে উন্নততর চিকিৎসা পেতে পারতেন, তা থেকে বঞ্চিত হন। প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসারী চিকিৎসকরা হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে বলছেন, এমনটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আবার উলটোদিকে, হোমিওপ্যাথরাও জটিল বা জরুরি অবস্থায় প্রথাগত ওষুধ খাবার পরামর্শ দেন। এক্ষেত্রেও অদক্ষতার প্রশ্নটি এসে পড়ে। তাই ক্রসপ্যাথি, যতটা সম্ভব এড়াবার চেষ্টা করাই উচিত।

হোমিওপ্যাথিতে গবেষণা

চিকিৎসা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হল গবেষণা। এর মাধ্যমেই বিজ্ঞানের নতুনতর উদ্ভাবনগুলি চিকিৎসা পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হয়। ন্যানোপ্রযুক্তি এবং অত্যাধুনিক গবেষণা কৌশলের সুবাদে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ইতিবাচক প্রভাবগুলি প্রমাণ করা এখন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

সাম্প্রতিককালে চিকিৎসাক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথির উপযোগিতা নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। এর মধ্যে ক্লিনিক্যাল গবেষণায় ১৯৭৫ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ৯৩টি সমীক্ষায় হোমিওপ্যাথিকে, প্লাসেবো ও অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। র‍্যান্ডমাইসড কন্ট্রোল ট্রায়াল—RCT-তে দেখা গেছে, ত্বক, শ্বাসনালির অ্যালার্জি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্ত্রীরোগ ও শিশুরোগের মোকাবিলায় হোমিওপ্যাথি বিশেষ কার্যকর।

তবে RCT-র মাধ্যমে সার্বিক প্রকৃত ছবিটা পাওয়া সম্ভব নয়। প্রথাগত সমীক্ষার গ্রহণযোগ্য পন্থা হলেও RCT-তে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বৈশিষ্ট্যগুলি সেভাবে ধরা পড়ে না। সার্বিক চিকিৎসা

পদ্ধতি হওয়ায় হোমিওপ্যাথি স্বনিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী, যেখানে রোগের মোকাবিলায় কোনও ব্যক্তির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে উজ্জীবিত করে তোলা হয়।

RCT-তে বর্তমানে নানা আধুনিক চিন্তাভাবনা সংযুক্ত করা হয়েছে। যেসব উপাদান চিকিৎসার ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, সেগুলিও বিবেচনা করা হচ্ছে। ওষুধ শুধু রোগ মোকাবিলার উপযুক্ত হলেই চলবে না, সেটিকে রোগীর পক্ষেও যথাযথ হয়ে উঠতে হবে—এই বিশ্বাস ক্রমশই সুদৃঢ় হচ্ছে। ব্যক্তিগত স্তরে চিকিৎসার এই নীতি বরাবরই হোমিওপ্যাথিক দর্শনের মূল ভিত্তি। লক্ষণ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এখানে ওষুধ নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে একাধিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বিচারের পাশাপাশি বেয়েস থিওরেম এবং লাইকলিহুড রেশিও-র মতো ধারণাগুলির প্রয়োগও ঘটানো হয়।

আরেকটি ক্ষেত্র হল মৌলিক গবেষণা, যেখানে হোমিওপ্যাথির গূঢ় কিছু প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ওষুধের মূল উপাদানগুলির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, মানুষ-প্রাণী বা গাছের দেহে ওষুধের প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চলে গবেষণা। একটি সফল মৌলিক গবেষণা পরবর্তী বিভিন্ন স্তরে গবেষণার মান ও রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। উন্নত মানের কোনও গবেষণা, অন্য গবেষণাগুলির লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। সেজন্যই মৌলিক গবেষণার ফলাফলে যাতে কোনও ভুল না থাকে, তা সুনিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক।

'হোমিওপ্যাথি' জার্নালে ২০০৯ ও ২০১০ সালে হোমিওপ্যাথির জৈবিক মডেল নিয়ে দুটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়, "এই ক্ষেত্র উত্তেজনাপূর্ণ ও গতিশীল। হোমিওপ্যাথিতে জৈবিক মডেলের বিপুল সম্ভার রয়েছে। গুণগত মান ও ইতিবাচক ফলের নিরিখে এই ক্ষেত্রের উৎসাহব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে।" Hom Brex নামে একটি তথ্যভাণ্ডার, গোটা বিশ্বে হোমিওপ্যাথি নিয়ে যাবতীয় মৌলিক গবেষণার হিসাব রাখে। তাদের হিসাব অনুযায়ী, হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণায় ভারতের স্থান বিশ্বে তৃতীয়। ভারত থেকে ২৩৭টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে গত দশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে ৮০টি গবেষণাপত্র।

হোমিওপ্যাথি নিয়ে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ মন্ত্রকের আওতায় ১৯৭৮ সালে 'হোমিওপ্যাথিতে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় পর্ষদ' (CCRH) নামে একটি স্বশাসিত সংস্থা গঠন করা হয়। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা হোমিওপ্যাথির উন্নয়নে সচেষ্ট। এর সদর দপ্তর দিল্লিতে, শাখা দেশের ২৯টি স্থানে বিস্তৃত। এই সংস্থা প্রধান যে বিষয়গুলির ওপর জোর দিয়েছে তা হল—ওষুধ তৈরি হয় এমন গাছের সংগ্রহ, সমীক্ষা ও চাষে উৎসাহ দেওয়া, ওষুধের নির্দিষ্ট মান স্থাপন, ওষুধের প্রামাণ্যকরণ, রোগ নির্ণায়ক পরীক্ষানিরীক্ষা, এ সংক্রান্ত গবেষণা, মহামারী নিয়ন্ত্রণ, সহযোগিতামূলক মৌলিক গবেষণা, তথ্যের নথিভুক্তিকরণ, সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতি। CCRH-এর কাজের খবর বিভিন্ন বিখ্যাত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এখানকার বিভিন্ন গবেষণা ও তার ফলাফল জানা যায় এর ওয়েবসাইট www.ccrh india.org-তে। এছাড়া সহযোগিতামূলক গবেষণার জন্য অনেক সময়ে সংস্থার তরফে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। এর হদিসও ওয়েবসাইটে মিলবে। সমসাময়িক গবেষণার হাল-হকিকত জানাতে CCRH নিজেও একটি জার্নাল প্রকাশ করে। www.ijrh.org ওয়েবসাইটে অনলাইনে এটি দেখা যায়। ভারতে হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত গবেষণাগুলির সম্বন্ধে জানাতে আয়ুষ মন্ত্রক 'হোমিওপ্যাথি : সায়েন্স অব জেন্টেল হিলিং' শীর্ষক একটি নথি প্রকাশ করেছে। http://www.ccrh india.org/Dossier/index.html-এ এটিও অনলাইনে দেখা যায়।

কলকাতার বোস ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় CCRH, জিন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্যানসারের ওপর Calcarea carbonicum ও Thuja নামে দুটি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছে। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের সঙ্গে গবেষণা চলছে জাপানি এনসেফ্যালাইটিস এবং 'সাকলিং মাইস' রোগের ওপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এএলএম পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব বেসিক মেডিক্যাল সায়েন্স'-এর সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবেটিক ইঁদুর এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, দিল্লির সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ক্ষেত্রে ন্যানো সায়েন্স-এর প্রভাব নিয়ে কাজ চলছে।

এত বহুমুখী বিস্তার সত্ত্বেও, হোমিওপ্যাথি নিয়ে গবেষণা এখনও এক বড় চ্যালেঞ্জ। ওষুধের সুরক্ষা, দক্ষতা থেকে শুরু করে শারীরবৃত্তীয় রাসায়নিক পরীক্ষানিরীক্ষা, ওষুধের স্বীকৃতি, ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধের প্রয়োগ— গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত। বিভিন্ন অজানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্তরে প্রয়াস চলছে।

সংক্ষিপ্তসার

হোমিওপ্যাথি আজ বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এর সম্বন্ধে ধারণা পালটাচ্ছে, আরও বেশি সংখ্যক মানুষ তাঁদের প্রাত্যহিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘকালীন রোগ থেকে মুক্তি পেতে হোমিওপ্যাথদের কাছে যাচ্ছেন। ওষুধের আকার যত ছোটই হোক না কেন, শান্ত, সুরক্ষিত, ব্যয়সাশ্রয়ী ও পাকাপাকিভাবে রোগমুক্তির মাধ্যমে হোমিওপ্যাথি মানবসভ্যতার উপকার করে চলেছে।

আপনি যদি এখনও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তাহলে নির্দ্বিধায় এগিয়ে যান। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বয়স কোনও বাধা নয়। রোগের ইতিহাস যেমনই হোক না কেন, হোমিওপ্যাথি তার একটা সুরাহা নিশ্চয়ই করতে পারবে। আজই আপনার নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের কাছে যান আর প্রাকৃতিক উপায়ে সুস্থ থাকুন।❑

[ডা. মানচান্দা ডাইরেক্টর জেনারেল।
email : rkmanchanda@gmail.com
ডা. কাউর সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো ও CCRH-এর প্রাক্তন উপদেষ্টা।
email : dr.harleenkaur@gmail.com]

NEW HORIZON STUDY CIRCLE

Main Office : 1/1, Shambhu Chatterjee Street, Kolkata-700 007
Website : www.newhorizonstudy.com E-mail : tojammelhossain786@yahoo.com
Contact : 9831050794, 9836484969

New Horizon Study Circle-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী তুজামমেল হোসেনের তত্ত্বাবধানে অগণিত শিক্ষার্থী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কর্মরত। তাদের কয়েকজনের নিজস্ব মতামত এখানে ব্যক্ত করা হল।

স্যার যেভাবে বিষয়ের গভীরে গিয়ে স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করিয়ে দেন ও একটি নতুন বিষয়কে সহজ করে দেন তা সত্যিই অতুলনীয়। স্যারের কাছে শুধু পরিকল্পনা বিষয়টি পড়তে এসে দেখলাম স্যার WBCS পরীক্ষার উপযোগী সব বিষয়ই পড়ান এবং ক্লাসে সবাই স্যারের প্রশংসা করে।

Piyali Mondal, WBCS (Exe.) 2011

আমি খুব কম সময়ের জন্য হোসেন স্যারের Attachment-এ এসেছিলাম এই Short Period এ-স্যারের কাছ থেকে আমার দুর্বলতার জায়গাগুলি বিশেষত Economics ও Maths এর Vital problems recover করতে পেরেছি এবং আমি যে Experience পেয়েছি তা থেকে যে কোন WBCS Aspirant কে স্যারের কোচিং এ ভর্তির ব্যাপারে Suggest করব।

Shayan Ahmmed (WBCS 13), DSP

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, অঙ্ক ও সাধারণ বুদ্ধিমত্তার বিষয়ে তাঁর অসামান্য পারদর্শিতা আমার কাছে চমকপ্রদ। বর্তমানে তিনি New Hotizon Study Circle নামে যে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা তাঁর Stewardship-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হবে তা অকপটে বলা যায়। Md. Saifur Rahaman R.N. 0204177 WBCS (2011), CTO

WBCS পরীক্ষার প্রস্তুতির সময় বেশ কয়েকটি স্যার ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও তুজামমেল হোসেন স্যারের সংস্পর্শে এসে আমি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছিলাম তা থেকে বলা যায় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক হিসাবে তিনি সর্বজন বিদিত এবং ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বিষয়ের তিনি একজন প্রবাদপ্রতিম। Sounak Banerjee, WBCS Group-A (2011)

বহুদিন শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় তুজামমেল হোসেন স্যার আমাকে যা দিয়েছেন তা আমার কাছে চিরস্মরণীয়।তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'New Horizon Study Circle' WBCS aspirant-দের জীবনে সাফল্যের দরজা খুলে দেবে তা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি। Surajit Mondal ,DSP, 2011

Sri Tojammel Hossain's books & personal guidance has helped me to score a descent marks in 'Indian Economy & Five Year Plan' paper. His tips on Arithmetics & G.I. was also very helpful.

Souvik Chakroborty (WBCS12)R.O.,R.N. 0204392

তুজামমেল হোসেন স্যারের কাছে অর্থনীতি ছাড়াও ইতিহাস, অঙ্ক ও প্রিলিমিনারির বিষয়গুলি নিয়মিত অভ্যাস করে আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং প্রথম বারেই সাফল্য আসে। Durbar Banerjee, DSP, (2010)

যে-কোন WBCS Aspirant হোসেন স্যারের কোচিং ও তাঁর লেখা বই পড়ে সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে পারবে তা অকপটে বলা যায়।এ ব্যাপারে কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে Call করুন-9051220549 Torikul Islam (WBCS 12) R.O., R.N. 0109409

হোসেন স্যারের NHSC একদিন এ রাজ্যে WBCS পরীক্ষার প্রস্তুতির কোচিং হিসাবে শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করবে তা সুস্পষ্ট।

Chitra Majumdar JSWS (WBCS 12) R.N. 0111650

এত কম সময়ে এবং এত কম খরচে WBCS পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায় তা হোসেন স্যারের কোচিং-এ এসেই জানলাম।

Kalyan Laha Jt. BDO (WBCS 12) R.N. 0207154

স্যার আমার Friend, philosopher and Guide আমি স্যার কে প্রণাম জানাই এবং স্যারের কোচিং -এর শিক্ষার্থীদের শুভ কামনা করি Dip Sankar Das (WBCS 11), R.O, R.N. 0208530

আমার সাফল্যের মূলেই আছেন তুজামমেল স্যার। তাঁর কোচিং ও তাঁর লেখা সব বইগুলির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা থাকলে Call করুন—9874688350

Monirul Islam (WBCS 12) R.O., R.N. 0108605

স্যারের কোচিং-এ জয়েন করার কিছুদিনের মধ্যে অন্য চাকরিতে জয়েন করি। তবে কর্মরত অবস্থায় স্যারের কাছে স্বল্প সময়ে যা পেয়েছি তার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। Rathin Sarkar. (WBCS 12) (Group-C)

WBCS প্রস্তুতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্যারকে কাছে পেয়েছি এবং এখনও স্যারের পাশেই আছি।

Mofijur Rahaman (WBCS 11) ACTO R.N. 0200771

আমি স্যারের কোচিং-এ WBCS পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলাম। তবে ইতিমধ্যে WBSSC পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে জয়েন করেছি এবং WBCS (Main) পরীক্ষা দিয়ে ফলের আশায় আছি। Anjan Chatterjee (WBSSC 13)

জায়গার অভাবে আরও শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারলাম না। আশা করছি পরবর্তীকালে তাদের বক্তব্যগুলি উপস্থাপন করব।

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

হাকিমি : স্বাস্থ্য ও আরোগ্য বিজ্ঞান

বীজ গ্রিসের। চারাগাছের ধাইমা মধ্যপ্রাচ্য। ভারতে পরিণতি লাভ। এ এক অন্যতম ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা। ইউনানি বা হাকিমি মহীরুহ এখন ডালপালা মেলছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। হাকিমি চিকিৎসার সাতসতেরো নিয়ে লিখছেন **অধ্যাপক রইস্-উর-রহমান।**

আগেকার কিছু কথা

হাকিমি বা ইউনানি এক সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতি। বর্তমান গ্রিস এর জন্মভিটে। মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ, চীন ও ভারতের সমকালীন সাবেকি চিকিৎসা পদ্ধতির এক মিশেল এই হাকিমি। রোগ-বালাইয়ের লক্ষণের নিছক উপশম নয়, পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা এর লক্ষ্য। অসুখ সারানো ও প্রতিরোধের পাশাপাশি হাকিমি পদ্ধতি স্বাস্থ্যের উন্নতি ও হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে।

হিপোক্রেটিসের পৃষ্ঠপোষণায় গ্রিসে হাকিমির চল শুরু হয় খ্রিস্ট জন্মের চার ও পাঁচ শতক আগে। এরপর আরব ও পারস্যে। আরবদের হাত ধরে হাকিমি ভারতে শিকড় গাড়ে হাজারখানেক বছর আগে। ক্রমে ক্রমে এ দেশই হয়ে ওঠে হাকিমির স্থায়ী সাকিন। এখানেই হাকিমি চিকিৎসা পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক বিকাশের তুঙ্গে ওঠে। কয়েকশো বছর যাবৎ এই পদ্ধতি এ দেশের সভ্যতায় এত চমৎকার খাপ খেয়ে গেছে যে হাকিমি আজ অন্যতম ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি বলে সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। এর বিকাশে সরকারি অর্থ বরাদ্দ বাড়ছে। মিলছে সরকারের মদত। গড়ে উঠেছে বেশ কিছু হাকিমি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ওষুধ শিল্প এবং হাসপাতাল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে দেশজুড়ে বহু হাকিমি হাসপাতাল ও চিকিৎসালয় সাধারণ মানুষের চিকিৎসা চালাচ্ছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দরুন হাকিমি দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে পা ফেলছে বিশ্বের আঙ্গিনায়। দক্ষিণ আফ্রিকার ওয়েস্টার্ন কেপ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাকিমি চিকিৎসার একটি পদ খোলা হয়েছে। আরও বেশ কিছু দেশে হাকিমি চিকিৎসা চেয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য কথাবার্তা এগিয়েছে অনেক দূর। হাকিমি চিকিৎসা ও গবেষণার একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা চলছে বহুদিন যাবৎ। স্নাতকোত্তর ও ডক্টরেট স্তরে পড়াশুনো এবং প্রশিক্ষণে নিখিল ভারত হাকিমি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য নীতিগত সায় দিয়েছে আয়ুষ মন্ত্রক। এ বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা।

হাকিমি চিকিৎসার মূল নীতি

নাম থেকেই স্পষ্ট হাকিমি বা ইউনানির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিসে। হাকিমির মৌলিক কাঠামো গড়ে উঠেছে গভীর দার্শনিক সূক্ষ্মজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি স্বাভাবিক/মূল অঙ্গ (উমার-এ-তাবা'ইয়াহ)-এর মতে মানবদেহ সাতটি মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এগুলি ঠিকঠাক রাখা দরকার। এই সাতটি হচ্ছে স্বভাব বা গুণ (আরকান), ধাত (মিজাজ), দেহরস (আখলাত), অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (আ'জ), মন (অর্বাহ) তেজ বা কর্মশক্তি (উব'হ) এবং কর্ম বা ক্রিয়া (আফা'আল)। হিপোক্রেটিস দেহরস তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তার মতে মানবদেহ তিন ধরনের পদার্থ দিয়ে গঠিত। কঠিন যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ (আ'জ) নামে পরিচিত। তরল (আখলাত) এবং বায়বীয় (অর্বাহ)।

ত্রিপদার্থ (মাবালিদ-এ-সালসা) তত্ত্বের মতে বিশ্বচরাচর কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিন পদার্থের সমাহার। হাকিমি চিকিৎসা নাড়ি (নব্জ), মূত্র (বাউল) ও মল (বরজ) ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়ের কথা বলে। বাতাস, জল, আগুন ও মাটি—এই চার উপাদানের তত্ত্ব এবং রক্ত, কফ, হলদেটে ও কালচে পিত্ত—এই চার দেহরস তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে হাকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থা। দেহরসের ভারসাম্য এদিক-ওদিক হলেই রোগ বাঁধে। সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই চার দেহরসের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য। হাকিমিতে রুগির ধাত বুঝে চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধাত আবার নির্ভর করে রক্ত, কফ, হলদেটে ও কালচে পিত্তের ভিত্তিতে। রুগির এই চার দেহরসের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনাই হাকিমি চিকিৎসার কাজ। হাকিমিতে চার ধরনের চিকিৎসা আছে—পথ্য (ডায়েটোথেরাপি), ব্যায়াম-পথ্য-জীবনযাত্রা (রেজিমেন্টাল থেরাপি), ওষুধপত্তর (ফার্মাকোথেরাপি) ও শল্য (সার্জারি)।

হাকিমির কুদরত বা জোর

নিছক রোগের লক্ষণের উপশম নয়। সার্বিক বা পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসায় অসুখ সারানো হাকিমির মূল কথা। রুগির ধাত বুঝে এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সঠিক জীবনযাত্রার ছ'টি আবশ্যক উপাদান (আসবাব-এ-সিত্তাহ, জারূরিযাহ) তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়। এগুলিই হাকিমির জোরালো দিক। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে তোলা হাকিমির এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। পেশি, শ্বাসনালি, চামড়া, লিভার (যকৃৎ), স্নায়ুর অসুস্থতা, সন্ধি বা গাঁটের প্রদাহ এবং আরও কিছু হঠাৎ বেড়ে ওঠা বা পুরনো রোগ-বালাইয়ে হাকিমি চিকিৎসায় ভালো ফল মেলে।

রেজিমেন্টাল থেরাপি হাকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার এক দান। ডায়েটোথেরাপি, রক্তমোক্ষণ (হিজামাহ), জোঁক দিয়ে রক্ত চোষানো (তালিক) ইত্যাদি রেজিমেন্টাল থেরাপির মধ্যে পড়ে। শরীর (তান্কিয়া) থেকে বদ রক্ত-রস দূর করতে সাহায্য করে এসব প্রক্রিয়া)। এসবের পাশাপাশি অনেক সময় ওষুধপত্তরও দেওয়া হয়। রেজিমেন্টাল থেরাপিতে ব্যথাবেদনা এবং নানা চর্মরোগের চিকিৎসায় খুব কম ওষুধ দিয়ে ভালো ফল মেলে। এতে হাকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে কাজ হয় চটজলদি।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রক খামীরা মার্বারীদ, জওহর মোহড়া ইত্যাদি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। যক্ষ্মা, এডস, ক্যানসার-এর মতো রোগে ওষুধপত্তর খেতে হয় অনেকদিন যাবৎ।

এসব ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমানো, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং জীবনের সার্বিক মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করে হাকিমি চিকিৎসা।

গ্যাসট্রাইটিস, পেপটিক আলসার, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, আর্থ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিস, স্নায়ুরোগ, উচ্চ রক্তচাপ-এর মতো হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত অসুখ, জীবনশৈলী ও বিপাকীয় রোগবালাই, যেমন, ডায়াবেটিস, অত্যধিক মোটা হয়ে যাওয়া, গেঁটেবাত এবং লিঙ্গ শিথিলতা, কামশীলতা, অতি শীঘ্র বীর্যস্খলন ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাকিমি খুব ভালো কাজ দেয়।

ভারতে হাকিমি শিক্ষা

হাকিমি চিকিৎসা শিক্ষা ও পসার-এর নিয়ামক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মেডিসিন। সাড়ে পাঁচ বছর পড়াশুনোর পর বিইউএমএস (ব্যাচেলর অব ইউনানি মেডিসিন সিস্টেম) ডিগ্রি মেলে। এমডি/এমএস কোর্সের মেয়াদ তিন বছর। এখন ভারতে স্নাতক স্তরের জন্য বিয়াল্লিশটি অনুমোদিত কলেজ আছে। এর মধ্যে আটটি কলেজে এমডি/এমএস কোর্সও পড়ানো হয়। স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার দিকটি দেখ-ভালের দায়িত্ব বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউনানি মেডিসিন-এর। স্নাতক পর্যায়ে আসন আছে ১৮৫১। আর স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হতে পারে ১৩৫ জন ছাত্রছাত্রী। হায়দরাবাদে বিজয়ওয়াড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি নিজামিয়া টিব্বি কলেজ, বেঙ্গালুরু রাজীব গান্ধী স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইউনানি মেডিসিন-এ সম্প্রতি পিএইচডি কোর্স খোলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে ভূমিকা

দেশে রেজিস্টার্ড হাকিমের সংখ্যা ৫০৪৭৫। এদের অধিকাংশ চিকিৎসা করে থাকেন গাঁয়েগঞ্জে। ২৫৯টি হাকিমি হাসপাতালে আছে ৩৭৪৪টি শয্যা। আর হাকিমি ডিসেপেনসারি ১৪৮৩টি। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনে অন্যান্য ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার ডাক্তারদের সঙ্গে হাকিমদেরও চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়। এঁরা কাজ করেন প্রাথমিক ও সমাজ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে।

গবেষণা

হাকিমি চিকিৎসায় গবেষণা ও বিকাশের ব্যাপারটি মূলত সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন-এর এক্তিয়ারে। কাউন্সিলের পত্তন ১৯৭৯-র ১০ জানুয়ারি। সদর দপ্তর দিল্লি। আর দেশের বিভিন্ন জায়গায় আছে কাউন্সিলের ২৩টি কেন্দ্র। হাকিমি নিয়ে গবেষণার ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

হায়দরাবাদ ও লখনউতে আছে কাউন্সিলের ২টি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। আটটি আঞ্চলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান—চেন্নাই, ভদ্রক, পটনা, দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা, আলিগড় ও শ্রীনগরে। দিল্লিতে লিটারারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ইউনানি মেডিসিন। ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইনস্টিটিউট গাজিয়াবাদে। ইলাহাবাদ ও শিলচরে আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র। ভোপাল, বুঢ়হানপুর, মেরঠ, বেঙ্গালুরু, কুর্নুল ও এড়াথালাতে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ ইউনিট। দিল্লিতে ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আলিগড়ে কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং ইম্ফলে ক্লিনিক্যাল রিসার্চ পাইলট প্রজেক্ট। দিল্লির ডঃ রামমনোহর লোহিয়া ও দীনদয়াল উপাধ্যায়—এই দুই অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালে বিনা পয়সায় হাকিমি চিকিৎসার কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

সেন্ট্রাল কাউন্সিল অব রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন সাধারণ মরশুমি জ্বরজারি চিকিৎসার জন্য হাকিমি ওষুধের এক কিট বের করেছে। এই কিট বাজারে ছেড়েছে জাতীয় গবেষণা বিকাশ নিগম। বার্ধক্য নিয়ে সমীক্ষা চালাবার পর কাউন্সিল প্রবীণদের জন্য একটি প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, বিভিন্ন চর্মরোগে হাকিমি ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাও চালিয়েছে কাউন্সিল।

গবেষণায় সহযোগিতা

কাউন্সিল ফর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ন্যাশনাল এডস কনট্রোল অর্গানাইজেশন-এর মতো নামজাদা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতায় কাউন্সিল গবেষণা চালায়।

ভারত সরকার হাকিমি-সহ চিরাচরিত ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বিস্তারে সচেষ্ট। এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য নজির, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৯-এ ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণার জন্য ভারত-মার্কিন কেন্দ্র (সিআরআইএসএম) স্থাপন। আয়ুষ মন্ত্রক এর উদ্যোক্তা। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার ওষুধপত্তর কতখানি নিরাপদ, তার মান ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলের উদ্বেগ-আশঙ্কা দূর করা ও এই চিকিৎসায় বিশ্বমানের গবেষণার পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যে আয়ুষ মন্ত্রকের এই উদ্যোগ। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিশ্বের আস্থা অর্জনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশেষত আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ ও হাকিমি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্বের মানুষের কাছে তুলে ধরতেও এই ভারত-মার্কিন কেন্দ্র সাহায্য করবে।

আয়ুষ মন্ত্রক একটি জাতীয় ভেষজ উদ্ভিদ পর্ষৎ গঠন করেছে। ভেষজ গাছপালা সংরক্ষণ, চাষ, বিপণনে সমন্বয় ও সাহায্য করবে এই পর্ষৎ। সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিতে ওষুধ সরবরাহ করে মোহন (উত্তরাখণ্ড)—এর ইন্ডিয়ান মেডিসিনস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এছাড়া, হাকিমি ওষুধ তৈরি করে বেশ কয়েকটি বেসরকারি করাখানা।

ওষুধের নির্দিষ্ট মান ও পেটেন্ট

সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন ইউনানি ফার্মাকোপিয়া কমিটির কারিগরি তত্ত্বাবধানে ২৯৮টি একক এবং ১০০টি একাধিক উপাদানবিশিষ্ট ওষুধের নির্দিষ্ট মান বা স্ট্যান্ডার্ড ধার্য করে দিয়েছে। পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ২৭৭টি একক উপাদান অর্থাৎ সিঙ্গল ওষুধের স্ট্যান্ডার্ড। আর ৩৮৫টি একাধিক উপাদান বা যৌগ ওষুধ ও হাকিমি ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীর (ফর্মুলেশন) ফিজিকো—কেমিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডের ৪টি খণ্ড বেরিয়েছে। ভারতের হাকিমি ফার্মাকোপিয়ার (ব্যবহারের নির্দেশ-সংবলিত স্বীকৃত ওষুধ তালিকা) ৬টি খণ্ডও সম্পূর্ণ। কাউন্সিল ৮টি ওষুধের পেটেন্ট পেয়েছে। ভারতীয় পেটেন্ট অফিসে

কাউন্সিলের আরও ৪৬টি আবেদন মঞ্জুরির অপেক্ষায়।

কাউন্সিল দু'টি বই বের করেছে। হাকিমি ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী বা ফর্মুলেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিবন্ধ আছে ফিজিকো-কেমিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডস অব ইউনানি ফুর্মলেশনস বইটিতে। বইয়ের চারটি অংশে আছে ৩৫০টি যৌগ হাকিমি ওষুধ নিয়ে নানা নিবন্ধ। আর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অব সিঙ্গল ড্রাগস অব ইউনানি মেডিসিন বইটি পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ডে ৫০টি একক উপাদানের ওষুধের নির্দিষ্ট মান (স্ট্যান্ডার্ড) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া, অন্য দুটি বই হল কেমিস্ট্রি অব ইউনানি মেডিক্যাল প্লান্টস এবং কেমিক্যাল ইনভেস্টিগেশন অব সাম কমন ইউনানি মেডিসিনাল প্লান্টস। কাউন্সিল ১৯৭৮ সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যের বনাঞ্চলে গাছপালা নিয়ে দফায় দফায় সমীক্ষা চালিয়েছে। এসব বনজঙ্গলের অধিকাংশের ধারেকাছে আদিবাসী বা জনজাতির বাস।

গবেষণার জন্য খাঁটি জিনিস পেতে কাউন্সিল পরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন ভেষজ গাছপালা চাষের কর্মসূচি নিয়েছে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে আছে আত্রিলাল (আম্মি মাজুস লিনন), ডালিম (গুলনার ফার্সি), কাম্পি, হাকুচ (বাবচি), কোরাসানি আজোয়ান (আম্বিন খুরাসানি), অশ্বগন্ধা (অসগান্ধ), অতীশ (অকনিতুম হেতেরফয়ল্লুম রফেল), সন্ধ্যামালতী (গুল-এ-আব্বাস), আত্মগুপ্ত (কঁচ), সতবরি (সত্বর), পানমৌরি (সন্‌ফ), গুরমার (গুর্মার্বুতি) ইত্যাদি।

প্রাচীন হাকিমি পুঁথিপত্রে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহার নিয়ে আছে বিস্তর লেখাজোখা। এসব অমূল্য সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারের মাশুল দিতে গিয়ে বেশ কিছু গাছপালা আজ নিশ্চিহ্ন। সঠিক ফর্মুলেশনের জন্য সাচ্চা ভেষজ পদার্থ পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া কিছু কিছু ভেষজ উদ্ভিদ/ওষুধ-এর শনাক্তকরণ নিয়ে বিতর্ক আছে। একথা মনে রেখে কাউন্সিল হায়দরাবাদে ভেষজ গাছগাছড়ার এক বাগিচা গড়ে তুলেছে। এই বাগানে আছে শখানেক ধরনের গাছপালা। ভেষজ গুণসম্পন্ন এসব গাছগাছড়া কাউন্সিলের পরীক্ষানিরীক্ষা বা কিট-এর জন্য খুব দরকারি।

ভেষজ উদ্ভিদ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কাউন্সিল তাদের আলিগড়, হায়দরাবাদ, চেন্নাই ও শ্রীনগরের নার্সারিতে শখানেক প্রজাতির গাছগাছড়া চাষের এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দেশের বিভিন্ন বন অঞ্চলে এথনো-বটানিক্যাল সমীক্ষার ভিত্তিতে প্রাপ্ত এথনো-ফার্মাকলজিক্যাল তথ্যাদি অঞ্চল অনুযায়ী সংকলন করা হয়েছে (মেডিসিনাল প্লান্টস ইন ফোকলোরস অব নর্দার্ন ইন্ডিয়া, সাদার্ন ইন্ডিয়া, কাশ্মীর হিমালয়াজ, নর্দার্ন ইন্ডিয়া-পার্ট টু, ওড়িশা-পার্ট টু, সাদার্ন ইন্ডিয়া-পার্ট টু) সাতটি ভাগে।

চিরাচরিত জ্ঞানের ডিজিটাল লাইব্রেরি

আয়ুষ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ যৌথ উদ্যোগ চিরাচরিত জ্ঞানের ডিজিটাল লাইব্রেরি। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন রিসোর্সের-এর মাধ্যমে এই লাইব্রেরি গড়ার কাজ করছে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ। দেশ থেকে গাছগাছড়া পাচার ও সনাতন হাকিমি ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী হাতানো রুখতে এই প্রচেষ্টা চলছে।

হাকিমি ওষুধ শিল্প

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা ইন্ডিয়ান মেডিসিন ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন লিমিটেডের পাশাপাশি হাকিমি ওষুধ তৈরির জন্য ৪৮৫টি কারখানার লাইসেন্স আছে।

হাকিমি ওষুধ তৈরি ও বিক্রি ১৯৪০-এর ওষুধ ও প্রসাধন সামগ্রী আইনের আওতাধীন। ওষুধের নির্দিষ্ট মান বা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের দিকটি দেখার দায়িত্বভার ফার্মাকোপিয়াল ল্যাবরেটরি ফর ইন্ডিয়ান মেডিসিন, ফার্মাকোপিয়া কমিশন অব ইন্ডিয়ান মেডিসিন, ইউনানি ফার্মাকোপিয়া কমিটি এবং সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন ইউনানি মেডিসিন-এর।

দেশ ভেদে ভিন পরিচিতি

হাকিমি চিকিৎসার কদর আছে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে। তবে দেশ ভেদে হাকিমি নামের বদলফের হয় এই যা।

- ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ আফ্রিকা—হাকিমি চিকিৎসা (ইউনানি তিব্ব)
- ইরান—চিরাচরিত ওষুধ (তিব্ব-এ-সুন্নাতি)
- পাকিস্তান—প্রাচ্য ওষুধ
- চীন—উইগার ওষুধ
- সংযুক্ত আরব আমিরশাহি—চিরাচরিত পরিপূরক বা বিকল্প ওষুধ
- কুয়েত—ইসলামি ওষুধ।

পরিশিষ্ট

অসুখ কমানো নয়, হাকিমির লক্ষ্য রোগবালাই-এর পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা। অসুখ সারানোর একটা আর্ট বা শৈলীর পাশাপাশি এ এক বিজ্ঞানও। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় হাকিমি খুব উপযোগী।

ভারত বাস্তুসংস্থানের বৈচিত্রে ভরপুর। এ দেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থাতেও তারই প্রতিচ্ছবি—বহাল তবিয়তে পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে হরেক কিসিমের চিকিৎসা। শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা ও অসুখ-বিসুখ সারাতে হাকিমি এক পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যবস্থা। হিপোক্রেটিস শুধুমাত্র হাকিমির প্রতিষ্ঠাতা নন, চিকিৎসাবিদ্যার জনক। চিকিৎসাকে তিনি কুসংস্কারের গণ্ডি থেকে বের করে নিয়ে আসেন। ষোড়শ শতক ইস্তক তার মতবাদ চিকিৎসা ব্যবস্থায় খুব গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। হাকিমির মৌলিক তত্ত্ববিকাশে আরব ও পারসিকদের অবদান বেশি। কিন্তু সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ ও তার প্রয়োগে ভারতীয় বিশারদরা একমেবাদ্বিতীয়ম্। ভারতে খুব সহজে ঠাঁই করে নেয় হাকিমি চিকিৎসা ব্যবস্থা। আয়ুর্বেদ ও হাকিমি যেন দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে। আয়ুর্বেদের বহু জিনিস নিজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে হাকিমি চিকিৎসা। হাকিমিতে ভারতীয় বিশারদদের ধারাবাহিক সৃজনশীলতার বড় প্রমাণ হাকিম আজম খানের মহাকোষ (এনসাইক্লোপিডিয়া) ও হাকিম আজমল খানের গবেষণা। এর সূত্রেই হাকিমিতে ভারতের উত্তরাধিকার।

হাকিমি চিকিৎসায় ভারত এখন এক অগ্রণী দেশ। হাকিমি শিক্ষা, গবেষণা ও ওষুধ উৎপাদনে এ দেশের জুড়ি মেলা ভার। এই চিকিৎসা ব্যবস্থায় সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য অনেক দেশ এখন ভারতের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে। ভারতকে তাই অনায়াসে বলা যেতে পারে হাকিমি চিকিৎসায় বিশ্বের চূড়ামণি।❑

[লেখক উপদেষ্টা (ইউনানি), আয়ুষ মন্ত্রক।
email : drrahman002@gmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

ভারতের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদ

ঔপনিবেশিক শাসকের চোখ রাঙানি যা পারেনি, আধুনিক বিশ্বায়িত জগতের চমক তা পেরেছে—এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আজ অবহেলিত, উপেক্ষিত। কিন্তু আয়ুর্বেদের মতো দেশজ চিকিৎসাশাস্ত্র ক্ষেত্রের সম্ভাবনা অপরিসীম। সঠিক নীতি প্রণয়ন করতে পারলে শুধু জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোই চাঙ্গা হবে না, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নও হবে। লিখছেন **ডা. অবিচল চট্টোপাধ্যায়।**

ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার কারণে এর অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সর্বদা উপযুক্ত পরিকল্পনা ও তার সার্থক রূপায়ণের উপর নির্ভরশীল। দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর ক্রমাগত জনবিস্ফোরণ, দেশভাগ, প্রতিরক্ষার অত্যধিক চাহিদা এবং অশিক্ষা ও দারিদ্র এই দেশের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অপুষ্টি, দারিদ্র, অসচেতনতা প্রভৃতি প্রতিনিয়ত দেশের স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করে চলেছে। মানুষ স্বদেশি শিক্ষা, নীতি, আহারবিধি, স্বাস্থ্যবিধি এবং চিকিৎসাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পাশ্চাত্য প্রীতির কারণে ক্রমাগত স্বখাত সলিলে ডুবে যাচ্ছে এবং দিনে দিনে এই দেশ সারা পৃথিবীর মধ্যে এক একটি রোগের রাজধানী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একটি সমীক্ষার হিসেব থেকে জানা যাচ্ছে ২০২০ সালে ভারতবর্ষে হৃদরোগে মৃত্যুর সংখ্যা হবে ২.৬ মিলিয়ন যা সারা পৃথিবীর হৃদরোগের ৫৪.১ শতাংশ (ন্যাশনাল সিভিডি ডেটা বেস)। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে হৃদরোগের জন্য মৃত্যু গড় আয়ুর প্রায় এক দশক আগে হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে ভারতে ৭০ বছরের নীচে হৃদরোগে মৃত্যু যেখানে ৫২ শতাংশ, অন্য দেশে তা ২৩ শতাংশ। আগামী ১০ বছরে ৬০ মিলিয়নের উপর রোগীর মৃত্যু হবে বিভিন্ন দুরারোগ্য বা ক্রনিক রোগে এবং এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ১৮ শতাংশ। ডায়াবিটিস, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের জন্য দেশের ক্ষতি হবে ২৩৭ বিলিয়ন ডলার। দেশের অর্থ বিনিয়োগের ৫.১ শতাংশ খরচ হয় স্বাস্থ্যখাতে এবং দেশের হেল্‌থ (স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত) বাজারে ব্যয় হয় মোটামুটি ১৪০৮ বিলিয়ন টাকা। অথচ বিপুল জনসংখ্যার এই দেশে মাথাপিছু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ কিন্তু অপ্রতুল।

স্বাধীনতার আগে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের চেহারা এমন ছিল না। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর আগে থেকেই এই দেশে আয়ুর্বেদের জন্ম এবং বিস্তার। প্রতিটি রোগের সাধারণ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার সবিস্তার অনুপুঙ্খ সাজানো রয়েছে এই চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতিটি রন্ধ্রে। তাই স্বাধীনতা লাভের ঠিক আগের আদমশুমারিতেও দেখা গেছে এই দেশের সমস্ত জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ জন তখনও আয়ুর্বেদের মতে চিকিৎসা নিতেন এবং বাকি ১৫ জন হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, অ্যালোপ্যাথির শরণাপন্ন হতেন। অথচ তখন অ্যালোপ্যাথিকে জনপ্রিয় করার জন্য ইংরেজ প্রশাসন অনেক হীন নীতির আশ্রয় নিয়েছিল—জোর করে আয়ুর্বেদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া, আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের দেওয়া মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বীকৃতি বাতিল করা, প্রভৃতি। এর মূলে ইংরেজদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল ব্যবসা। এ দেশে অ্যালোপ্যাথি চালু করতে পারলে তখনকার দিনে প্রায় আট কোটি টাকার ওষুধের ব্যবসা পেত ব্রিটিশ সরকার। সুতরাং তারা সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবে না এটাই স্বাভাবিক। অথচ পরাধীন ভারতে ব্রিটিশরা যা করতে পারেনি, স্বাধীন ভারতে সেটাই আজ বাস্তব। এখন শতকরা ৮৫ জনের বেশি মানুষ অ্যালোপ্যাথির চিকিৎসা নেন। দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য ৯৮ টাকা যায় অ্যালোপ্যাথির গর্ভে। বাকি ২ টাকায় পোষণ হয় আয়ুর্বেদ, যোগ, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথির। দেশের এই টাকা যাচ্ছে কোথায়? মাল্টি-ন্যাশনালের গর্ভে আর উন্নত দেশের অর্থভাণ্ডারে। অথচ আয়ুর্বেদের দেখানো পথে যদি হাঁটা যেত, এত রোগের প্রাদুর্ভাবও হত না, এবং তুলনায় কম মূল্যে দেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা চলতে পারত। সর্বোপরি দেশের টাকা দেশেই থাকত, উপরন্তু বহু বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যেত এর দ্বারা।

বাজারের গতি

এই মুহূর্তে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বাজারের গতি বেশ পরিবর্তনশীল। মোটের উপর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আগের তুলনায় ভালো হওয়ার কারণে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিরতার কারণে দেশে স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেক বেড়েছে। এখন শিশু জন্মের হার অনেক কম। সময়মতো চিকিৎসা পাওয়ার কারণে গড় আয়ুও বেড়েছে। ফলে এখন জরাজনিত ব্যাধির চিকিৎসার জন্য খরচ বেড়েছে অনেক। সেজন্য সরকারের স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু খরচের পরিমাণও বেড়েছে অনেকটা।

এখন জীবনযাত্রা-সংক্রান্ত রোগের সংখ্যা বেড়েছে অনেক অনেক গুণ। আয়ুর্বেদে যে ধরনের খাবারদাবার ও আচরণবিধি বলা হয়েছে, তা অনেক বেশি স্বাস্থ্যসম্মত। কিছু দৈনন্দিন চর্যা ও ঋতুকালীন করণীয় মেনে চললে মানুষ অনেক রোগ থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে। আয়ুর্বেদে বহু 'বিরুদ্ধ' খাবারের কথা বলা আছে যা শরীরের পক্ষে অহিতকারী ও রোগ উৎপাদক। যেমন মধু গরম করে খাওয়া। অথচ এখন বহু জনপ্রিয় বিদেশি ব্র্যান্ডের চিকেন (মুরগির মাংস) মধুতে ম্যারিনেট করে (মেখে বা ভিজিয়ে রেখে) ভাজা হয়। দুধ ও মাছ একসঙ্গে বা দই গরম করে খাওয়া একেবারেই উচিত নয়। অথচ 'ফিউশান ফুড'-এর নামে এখন যা খাওয়া হয় তা কোনও মতেই আয়ুর্বেদ সম্মত নয়। 'চিলড্ (ঠান্ডা) ফুড' এবং 'টিনড্ ফুড' সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। এসব কারণে এখন প্রতি বছর প্রায় সাত লাখ নতুন ক্যানসার রোগীর খোঁজ মেলে ভারতে। ৪০ মিলিয়নের বেশি লোক ভোগেন ডায়াবেটিসে, ৫.১ মিলিয়ন এডসে, ১৪ মিলিয়ন যক্ষ্মা রোগে।

এই সব রোগ প্রতিহত করার জন্য সরকার যেসব পরিকল্পনা নিয়েছে (১১তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ৪ জানুয়ারি, ২০০৮) তাতে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৬২০.৫ কোটি টাকা। আর এতে ফুলে ফেঁপে উঠছে সেই সব ওষুধ কোম্পানিগুলি যারা এই সব রোগের ওষুধ তৈরি করে। এখন সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মাত্র ২০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাকি ৮০ শতাংশ রয়েছে বেসরকারি হাতে। বিভিন্ন হেল্‌থ প্যাকেজের প্রলোভনে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর দৌলতে সাধারণ মানুষ তাঁদের গাঁটের কড়ির একটি মোটা অংশ খরচ করছেন নিজেদের স্বাস্থ্য ফেরাতে। কেননা এ দেশে স্বাস্থ্যবিমা মোট জনসংখ্যার মোটে ১৪ শতাংশের হাতে রয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মোট খরচের ৬৪ শতাংশই আসে সাধারণ মানুষের পকেট থেকে।

আয়ুর্বেদ—একটি বিকল্প

এখন সারা দেশে প্রায় ১৫৩৯৩টি অ্যালোপ্যাথি হাসপাতাল রয়েছে—যার মধ্যে ১১৩৪৪টি বেসরকারি ও ৪০৪৯টি সরকারি। হাসপাতালের মোট শয্যা সংখ্যা প্রায় ৮,৭৫,০০০ যেখানে ভারতের জনসংখ্যা প্রায় ১২৫ কোটি। সেই তুলনায় সারা দেশে আয়ুর্বেদ হাসপাতালের সংখ্যা একটা ভগ্নাংশেও আসে না। কিছু বহির্বিভাগভিত্তিক সাধারণ চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, তাও মোট জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। এই সীমিত সংখ্যক হাসপাতাল, সীমিত শয্যা ও সীমিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক দিয়ে দেশের কোনও বিকল্প গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। অন্যদিকে মোট অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের সংখ্যা ৫,৯২,২১৫, নার্স ৭,৩৭,০০০, ডেন্টিস্ট (দাঁতের ডাক্তার) ৮০,০০০।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যদিও আয়ুষ বিভাগের কল্যাণের জন্য তৎপর এবং সারা দেশে এই শাখার প্রসারের জন্য দারুণ আগ্রহী। তবুও আরও কিছু তৎপরতার দরকার আছে আয়ুর্বেদের প্রচারে ও প্রসারে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, সরকারের আনুকূল্য কোনও মতেই আয়ুর্বেদের প্রতি করুণা করে নয়, সরকারের নিজেরই প্রয়োজনে এই শাখার প্রভূত বিস্তার প্রয়োজন। এই চিকিৎসাশাস্ত্র তার অপরিসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার দিয়ে সারিয়ে তুলতে পারে সেই সব রোগ যাদের চিকিৎসা এখনও অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রে নেই। বিভিন্ন জীবনযাত্রা-সংক্রান্ত রোগ-ভোগ (লাইফস্টাইল রিলেটেড ডিজিজ), বার্ধক্যজনিত রোগ, কর্কট রোগ বা ক্যানসার, বিভিন্ন স্নায়বিক রোগে, হাড়ের সমস্যায় এবং আরও ছোট-বড় নানান সমস্যায় আয়ুর্বেদ এখনও অন্যান্য চিকিৎসার থেকে অনেক এগিয়ে। ফলে নিজের দেশের সমস্ত নাগরিকদের যেমন শারীরিক নিরাময় দেওয়া যাবে তেমনি সরকারের আর্থিক তহবিলও হবে মজবুত। এসব রোগের জন্য সরকারের থেকে বা বাজার থেকে যে পরিমাণ

সারণি-১

একাদশ ও দ্বাদশ যোজনায় স্বাস্থ্য দপ্তরের খাতে বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়) এবং মন্ত্রকের খাতে মোট বরাদ্দের অংশভাগ (শতাংশে)

দপ্তর	একাদশ যোজনায় বরাদ্দ	একাদশ যোজনায় ব্যয়	দ্বাদশ যোজনায় বরাদ্দ	একাদশ যোজনায় ব্যয়ের তুলনায় বৃদ্ধি (শতাংশে)
● স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর	১৩১,৬৫১ (৯০%)	৮৩,৪০৭ (৯৮.১১%)	২,৬৮,৫৫১ (৮৯.৫১%)	৩২২%
● আয়ুষ দপ্তর	৩,৯৮৮ (২.৭%)	২,৯৯৪ (৩.৩৪%)	১০,০৪৪ (৩.৩৫%)	৩৩৫%
● স্বাস্থ্য-গবেষণা দপ্তর	৪,৪৯৬ (৩%)	৮৭০ (২.০৯%)	১০,০২৯ (৩.৩৪%)	৫৩৬%
● জাতীয় এডস্ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা	৫,৭২৮ (৪%)	১,৩০৫ (১.৪৬%)	১১,৩৯৪ (৩.৮০%)	৮৭৩%
মোট	**১,৪৫,৮৬৩ (১০০%)**	**৮৯,৫৭৬ (১০০%)**	**৩,০০,০১৮ (১০০%)**	**৩৩৫%**

বিঃদ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মোট বরাদ্দের শতকরা ভাগ।
তথ্যসূত্র : একাদশ ও দ্বাদশ যোজনা, যোজনা কমিশন, ভারত সরকার।

অর্থ প্রতি বছর দেশের বাইরে যায়—তা অনেকাংশেই বন্ধ করা যাবে। সর্বোপরি সরকার যদি অন্যান্য দেশে আয়ুর্বেদের কার্যকারিতার কথা প্রচার করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় এবং সেখানে আয়ুর্বেদকে স্বীকৃতি দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে, তবে বছরে সব থেকে বেশি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ুর্বেদ থেকেই আসবে। এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে যোগ অত্যন্ত জনপ্রিয়; অথচ এর থেকে মানব কল্যাণ ছাড়া সরকারের রোজগারের পথ একদম নেই। অথচ যোগ-এর সঙ্গে আয়ুর্বেদকে যদি সুচারুভাবে মিশিয়ে বিপণন করা যেত তবে আখেরে লাভ হত সবারই। লোকেরাও বেশি উপকৃত হত, সরকারও কিছু অতিরিক্ত রোজগার করতে পারত। আগে শ্রীলঙ্কায় নিজেদের কোনও আয়ুর্বেদ কলেজই ছিল না। সেখানকার ছাত্ররা কলকাতায় এসে আয়ুর্বেদ শিক্ষা নিত। এখন ওই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের শতকরা ৭২ ভাগ আসে আয়ুর্বেদের হাত ধরেই। তবে ভারত এই বিদ্যার মাতৃভূমি হয়েও কেন পিছিয়ে থাকবে?

যদি কাঁচা ভেষজের আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে দেখা যায়, সেখানে ভারতের রপ্তানিকৃত ভেষজের পরিমাণ পরিসংখ্যানের বিচারে দ্বিতীয় হলেও অঙ্কের নিরিখে চীনের থেকে অনেক কম। উন্নতমানের হিমালয়জাত ভেষজ ভারতেই বেশি হয়। তবুও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ভারত প্রথম জায়গাটা দখল করতে পারেনি এতদিন। ২০১০ সালে ভারতের রপ্তানিকৃত ভেষজের আর্থিক মূল্য ছিল ২৬৮.০৬ মিলিয়ন ডলার যেখানে চীনের পরিমাণ ১৩২৯.৭২ মিলিয়ন ডলার। ২০১১ ও ২০১২ সালে ভারতের ক্ষেত্রে রপ্তানিকৃত ভেষজ পণ্যের আর্থিক মূল্য ছিল যথাক্রমে ২৯৮.৫৯ ও ৩৫৮.৩০ মিলিয়ন ডলার। ভারত যেসব ভেষজ বাইরে রপ্তানি করে তার মধ্যে ইসবগুল ও সোনাপাতা প্রধান। ভারত মূলত রপ্তানি করে রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, কাজাকস্থান, আরব আমির শাহি, নেপাল, ইউক্রেন, ফিলিপিন্স, কেনিয়া, মরিশাস-এ। এদের মধ্যে রাশিয়া সব থেকে বেশি (প্রায় ১৪০ কোটি টাকার জিনিস) আমদানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেনে প্রায় ১০৪ কোটি, কাজাকস্থান ৫৬ কোটি। আশার কথা, এই রপ্তানির পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১০-২০১১-তে ৯.৬৮ কোটি টাকা বেশি রপ্তানি করা গেছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০০৯-২০১০-এ ১১০.০১ কোটি টাকা বেশি রপ্তানি হয়েছে। তবে মোট ১৪ হাজার কোটি টাকার বাজারে এই পরিমাণ অনেকটাই কম।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়া

এখন ধীরে ধীরে আয়ুর্বেদের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুর্বেদিক ভেষজের দামও আকাশছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন স্বনির্ভরগোষ্ঠীর দ্বারা যদি বিভিন্ন জায়গায় আয়ুর্বেদিক ভেষজ চাষ করা যায় এবং কিছু কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ, সাবান, শ্যাম্পু ইত্যাদি বানানো যায়, তবে লাভ হবে দেশেরই।

প্রচুর সংখ্যক বেকার এইভাবে সমবায় পদ্ধতিতে আয়ুর্বেদিক ভেষজ চাষে প্রবৃত্ত হলে দেশের চালচিত্রই বদলে যাবে। দেশে আয়ুর্বেদিক কোম্পানিগুলো যেমন উন্নতমানের ভেষজ সহজে কিনতে পারবে, তেমনি এগুলি বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা উপার্জন করা যাবে। সরকারকে শুধু এর জন্য মধ্যস্থতা করতে হবে। ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে ঋণ দিয়ে যদি এই শিল্পকে উৎসাহিত করা যায় তবে আখেরে লাভ হবে সব পক্ষেরই।

সরকারের করণীয়

মানসিক এবং শারীরিকভাবে সক্ষম লোকেরাই একটি মজবুত ও অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম দেশ গড়ে তুলতে পারে। এই জন্য সরকারকে শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার করতে হবে। ছোটদের পাঠ্যবইতে আয়ুর্বেদে বলা স্বাস্থ্যবৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দিনভিত্তিক বা ঋতুকালীন কী কী ধরনের কাজ করা উচিত, কী কী ধরনের খাবার খাওয়া উচিত বা কী উচিত নয়, যদি শিশু মনেই ঢুকিয়ে দেওয়া যেতে পারে তবে বহু ধরনের রোগ থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া যাবে।

একটু উঁচু ক্লাস (শ্রেণি) থেকেই যোগ বাধ্যতামূলক করতে হবে। সবল ছাত্রছাত্রীরাই জাতির মেরুদণ্ড। যোগ যেমন শারীরিকভাবে তাদের সুস্থ রাখবে, তেমনি প্রতিহত করবে নানান মানসিক বিকার। তরুণ প্রজন্ম আরও বেশি অধ্যবসায়ী হয়ে উঠবে।

চিকিৎসাক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের প্রসার ঘটাতে হবে আরও ব্যাপকভাবে। যে সমস্ত রোগে অন্যান্য শাস্ত্র তেমনভাবে ফলপ্রসূ নয়, সরকারকে সে সব ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদকেই গ্রহণ করার কথা প্রচার করতে হবে। হৃদরোগে সরকার সারা বছরে যে টাকা খরচ করে, সামান্য কিছু আয়ুর্বেদিক বিধিনিষেধ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হলে, সেই খরচ যেমন বাঁচানো যাবে, তেমনি হৃদরোগকেও প্রতিহত করা যাবে। ডায়াবেটিস, ক্যানসার প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সরকার এখন ক্যানসারের অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিনামূল্যে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেমোথেরাপি ইত্যাদি যথেষ্টই ব্যয়সাপেক্ষ। এর পরিবর্তে যদি সরকার ক্যানসারে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার কথা ভাবে, তবে অনেক কম খরচে রোগীর কল্যাণ করা যাবে।

সারণি-২
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন দপ্তরের জন্য কেন্দ্রীয় যোজনা-ভুক্ত খাতে বরাদ্দ
(কোটি টাকায়)

দপ্তর	২০১১-২০১২	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩	২০১৩-২০১৪
● স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর	২০৬৬৯.৩৬	২৭১২৭.০০	২২০০০.০০	২৯১৬৫.০০ (৮৯%)
● আয়ুষ দপ্তর	৬১১.৪৭	৯৯০.০০	৬৭০.০০	১০৬৯.০০ (৩.৩%)
● স্বাস্থ্য-গবেষণা দপ্তর	৫৬৪.৫০	৬৬০.০০	৪৬৪.০০	৭২৬.০০ (২.২%)
● এডস্ নিয়ন্ত্রণ দপ্তর	১৩১৩.৮৬	১৭০০.০০	১৭৫৯.৫৬	১৭৮৫.০০ (৫.৫%)
মোট	**২৩১৫৯.১৯**	**৩০৪৭৭.০০**	**২৪৮৯৩.৫৬**	**৩২৭৪৫.০০**

তথ্যসূত্র : কেন্দ্রীয় বাজেট ২০১৩-১৪।

সারণি-৩
ভারতের রপ্তানিকৃত ভেষজ পণ্যের আর্থিক মূল্য

ক্রমিক সংখ্যা	পণ্য	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
১.	আয়ুষ পণ্য*	১৪৭.৮৪	১৫৬.৯৬	১৮২.১৮
২.	ভেষজ ওষুধ ও সংশ্লিষ্ট পণ্য	১২০.২২	১৪১.৬৩	১৭৬.১২
	মোট	**২৬৮.০৬**	**২৯৮.৫৯**	**৩৫৮.৩০**

★ আয়ুর্বেদ, সিদ্ধা, ইউনানি ইত্যাদি।

ইউরোপীয় এবং অন্য উন্নত রাষ্ট্রে, ভারতীয় ভেষজ, আয়ুর্বেদিক এবং ঔষধি গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। যেখানে ২০১০-১১-এ কেবল ইউরোপিয়ান রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় বনৌষধির রপ্তানি মূল্য ছিল ৪০.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, সেখানে ২০১১-১২-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৭.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ বৃদ্ধি পায় ৪১.৬১ শতাংশ।

প্রধান রপ্তানিকৃত উন্নত দেশ।

ভেষজ, আয়ুর্বেদিক এবং ভেষজ ওষুধ	**আয়ুষ পণ্য**
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ইউ.কে।	রাশিয়া, জাপান, ইউ.এ.ই, ইউ.এস.এ., কানাডা।

আগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সব থেকে বড় সুবিধা ছিল, এটির খরচ ছিল খুবই কম। হাতের কাছেই ছিল সব রকমের গাছগাছড়া। ফলে কবিরাজ মশাইরা দক্ষিণাটুকু বাদ দিলে প্রায় বিনে পয়সাতেও যে কোনও রোগের চিকিৎসা করা যেত। কিন্তু অধুনা সভ্যতার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বহুতল বাড়ি ও কারখানা সব জমি গিলে নিয়েছে। তা সত্ত্বেও যে জমি ছিল, তাতে মানুষ অজ্ঞতার কারণে ও সমাজে আয়ুর্বেদের প্রচলন কমে যাওয়ার কারণে আর তেমনভাবে সেই সব ওষধি গাছগাছড়ার চাষ করে না। যাদের পুরনো গাছপালা ছিল, তারাও তা কেটে ফেলেছে নির্দয়ভাবে। এখন সরকারের উচিত এই সব গাছপালার প্রতি মানুষকে সচেতন করা। এতে পরিবেশও বাঁচবে, শরীরও সুস্থ থাকবে।

বিজ্ঞাপন এ যুগের সব থেকে বড় 'অনুপ্রেরণা'। সরকার যদি নিরন্তর পর্যটন শিল্পের সঙ্গে আয়ুর্বেদকে জুড়ে দেওয়ার কথা প্রচার করে, তবে অনেক বিদেশি এতে আকৃষ্ট হবেন। এই পন্থা অবলম্বন করে কেরালার ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে এখন আয়ুর্বেদ শিল্পের আকার ধারণ করেছে। কেরালার সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মান অনেক উন্নত এবং তা মূলত আয়ুর্বেদের কারণেই।

সুতরাং সরকার যদি আয়ুর্বেদকে কাজে লাগায় তাতে মানব কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতিরও অনেক উন্নয়ন হবে। সাধারণ মানুষ আরও অনেক ভালোভাবে বাঁচতে শিখবে, তাতে আখেরে লাভ হবে দেশের ও দশের।❑

[লেখক শ্যামদাশ বৈদ্য শাস্ত্রপীঠের আওতাধীন ইনস্টিটিউট অব পি জি আয়ুর্বেদ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর অধ্যাপক।]

পশ্চিমবঙ্গে 'আয়ুষ' চিকিৎসা পদ্ধতি

আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি—এই নিয়ে 'আয়ুষ'। এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে ভারত সরকার। রাজ্য সরকারও এই পদ্ধতিগুলিকে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এই জন্য জেলায় জেলায় কলেজ খোলা হয়েছে, প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং এসব কিছুর ফলও পাওয়া যাচ্ছে। অনেক অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে এই পথে এগিয়ে আসছেন এবং এইসব বিকল্প চিকিৎসা প্রয়োগের ফলে উপকৃতও হচ্ছেন অনেকে। বিস্তারিত জানাচ্ছেন **অধ্যাপক (ডাঃ) অখিলেশ খাঁ, ডাঃ কাজল ভট্টাচার্য** *এবং* **ডাঃ পি. বি. কর মহাপাত্র।**

ভারত সরকার বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি-গুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই 'আয়ুষ' চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি হল আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি, সিদ্ধা এবং হোমিওপ্যাথি। পশ্চিমবঙ্গে স্বীকৃত আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলি হল আয়ুর্বেদ, যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিগুলিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

আয়ুষ সংক্রান্ত কোর্স

আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতির স্নাতক কোর্স (ডিগ্রি কোর্স)-এ ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা JENPARH দিতে হয়। পরীক্ষার ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গ 'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' পরীক্ষা বোর্ড (www.wbjeeb.in)।

মেধা তালিকা প্রকাশের পর পৃথক পৃথক কোর্সে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং করা হয়। এবং মেধা অনুযায়ী কোর্স ও কলেজ প্রদান করা হয়।

কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর অধীনস্থ সেন্ট্রাল সিলেকশান কমিটি (আয়ুষ), স্বাস্থ্য ভবন, জি.এন.-২৯, সেক্টর-৫, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৯১।

চেয়ারম্যান, সেন্ট্রাল সিলেকশান কমিটি (আয়ুষ)—শ্রী শ্যামল চন্দ্র মণ্ডল, ডব্লু.বি.সি.এস., ৯৮৩৬৭৩৬৬৬৯।

সারণি-১
বিভিন্ন কোর্স ও ন্যূনতম যোগ্যতা

কোর্সের নাম	ন্যূনতম যোগ্যতা
বি.এইচ.এম.এস. (হোমিওপ্যাথি স্নাতক)	১০ + ২/সমতুল্য সফল বা উত্তীর্ণ প্রার্থী। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিভাগে পৃথকভাবে অবশ্যই সফল হতে হবে।
বি.এ.এম.এস. (আয়ুর্বেদ স্নাতক)	১০ + ২/সমতুল্য সফল বা উত্তীর্ণ প্রার্থী। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিভাগে একত্রে ৫০ শতাংশ পেয়ে সফল হতে হবে।
বি.ইউ.এম.এস. (ইউনানি স্নাতক)	১০ + ২/সমতুল্য সফল বা উত্তীর্ণ প্রার্থী। পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিভাগে একত্রে ৫০ শতাংশ পেয়ে সফল হতে হবে এবং অবশ্যই উর্দু, আরবি বা ফার্সি বিষয়ে সফল থাকতে হবে।
যোগ	কোনও কোর্স এখনও নেই। তবে সরকার এ প্রসঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে উদ্যোগ নিয়ে চালু করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মেম্বার সেক্রেটারি, সেন্ট্রাল সিলেকশান কমিটি (আয়ুষ)—অধ্যাপক (ডাঃ) অখিলেশ খাঁ, ৯৪৩৩৩৮৭৩৩৩।

আয়ুষ স্নাতকোত্তর (এম.ডি.) কোর্সে ভর্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকার পরীক্ষা নিয়ে থাকে। ওয়েবসাইট www.thewbuhs.org।

আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিতে গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিএইচডি করার সুযোগ আছে। আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে গবেষণা করার সুযোগও রাজ্য সরকার দিয়েছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর ডি.এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ-কে গবেষণা করার জন্য চিহ্নিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে আয়ুষ সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করা হল।

পশ্চিমবঙ্গে আয়ুর্বেদ

ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা পদ্ধতি 'আয়ুর্বেদ' সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বাংলার প্রথিতযশা বৈদ্যকুল তাঁদের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা নৈপুণ্যের জন্য সমাদৃত হতেন সারা ভারত তথা বিশ্বে। সেই পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে আয়ুর্বেদের অবস্থান কেমন? এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাই বা কী? সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করা যাক—

(ক) শিক্ষা ও গবেষণাগত অবস্থান।

১। স্নাতকস্তরের আয়ুর্বেদ শিক্ষা। প্রতিষ্ঠান—সরকারি কলেজ মাত্র ১টি ও বেসরকারি কলেজ মাত্র ২টি।

সরকারি কলেজ—জে.বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত, বার্ষিক ৬০টি ছাত্র ভর্তি হয়, এই কলেজে ১২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ এবং এই কলেজের অধীনে থাকা পাতিপুকুর অঞ্চলে ৯৪ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল চালু আছে। সুনামের সঙ্গে উভয় হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

এখানে বাৎসরিক বহির্বিভাগে আনুমানিক ৩০ হাজার রোগীর পরিষেবা দেওয়া হয় এবং অন্তর্বিভাগে আনুমানিক ৬০০ রোগী ভর্তি থাকে।

বেসরকারি কলেজ—২টির মধ্যে প্রথমটি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কাঁকিনাড়া সন্নিকটস্থ 'রাজীব গান্ধী মেমোরিয়াল আয়ুর্বেদিক কলেজ ও হাসপাতাল'। প্রায় ১৩ বছর ধরে চলছে। এখানে প্রতি বৎসর ৫০ জন ছাত্র স্নাতকস্তরে ভর্তি হয় দ্বিতীয়টি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি শহরে অবস্থিত 'রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়' তিন বৎসর ধরে চালু হয়েছে। এখানে প্রতি বৎসর স্নাতকস্তরে ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি হয়।

এখানে আনুমানিক ৩০০০ রোগীর বহির্বিভাগে এবং প্রায় ৩০০ রোগীর অন্তর্বিভাগে চিকিৎসা হয়।

স্নাতকস্তরের পাঠক্রম কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থা সি.সি.আই.এম. অনুমোদিত সাড়ে চার বছরের কোর্স, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে 'আয়ুর্বেদাচার্য বি.এ.এম.এস.' ডিগ্রি লাভ হয়।

২। স্নাতকোত্তর স্তরের আয়ুর্বেদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাত্র ১টি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কলকাতার রাজাবাজারে 'ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট আয়ুর্বেদিক এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (শ্যামদাস বৈদ্য শাস্ত্রপীঠ) নামে পরিচিত, এখানে প্রতি বৎসর ১০ জন 'আয়ুর্বেদ বাচস্পতি এম.ডি. (আয়ুঃ)' কোর্সে ভর্তি হন। মোট ৪টি বিভাগে এম.ডি. চালু আছে যেখানে কায়া চিকিৎসা বিভাগের জন্য ৪টি আসন এবং বাকি তিনটি যথা—রোগ নিদান বিকৃতিবিজ্ঞান, দ্রব্যগুণ বিজ্ঞান ও আয়ুর্বেদ সিদ্ধান্ত বিভাগের জন্য ২টি করে আসন বরাদ্দকৃত। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সি.সি.আই.এম. অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী ডিগ্রি লাভ হয়, গবেষণা কার্যের সঙ্গে পিএইচডি (আয়ুঃ) প্রোগ্রামও চলে। এখানে ৭৫ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগে এবং হাসপাতালের বহির্বিভাগে সুনামের সঙ্গে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

এখানে বাৎসরিক আনুমানিক ৭০,০০০ রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হয় এবং অন্তর্বিভাগে প্রায় ১০০০ রোগী ভর্তি থাকেন।

৩। **ফার্মেসি স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**—সরকারি কলেজ ১টি ও বেসরকারি কলেজ ১টি।

সরকারি কলেজ—'বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়'। কলকাতার হাতিবাগান সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। এখানে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ফার্মেসি-র সার্টিফিকেট কোর্সে পঠন-পাঠন ও ট্রেনিং হত। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৪ সাল থেকে এই সার্টিফিকেট কোর্সকে ডিপ্লোমা কোর্সে উন্নীত করেছে। এখানে প্রতি বৎসর ২০ জন ভর্তি হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ পরিষদের অধীনে ডিপ্লোমা পায় এবং নাম রেজিস্ট্রীকৃত করে। এই কলেজের সঙ্গে রোগী পরিষেবার জন্য ২০ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ এবং বহির্বিভাগ যুক্ত হাসপাতালও রয়েছে। এখানে বাৎসরিক প্রায় ৩০,০০০ রোগী বহির্বিভাগে চিকিৎসিত হয় এবং অন্তর্বিভাগে প্রায় ২০০ জনেরও অধিক রোগী ভর্তি হয়।

বেসরকারি কলেজ—নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত 'বেঙ্গল ইনস্টিটিউট অব ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্সেস ইন আয়ুর্বেদ' নামে একটি ফার্মেসি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত বি-ফার্মা (আয়ু) ও এম. ফার্মা (আয়ু) কোর্স দুটি চলে। আসন সংখ্যা যথাক্রমে ৬০টি ও ২০টি।

৪। (ক) কেন্দ্রীয় সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাত্র ১টি, যা কলকাতার সল্টলেকের সেক্টর ৫-এ অবস্থিত 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর আয়ুর্বেদিক ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট' নামে পরিচিত। এখানেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য ২০ শয্যাবিশিষ্ট অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ চালু আছে। এখানে বহির্বিভাগে বাৎসরিক আনুমানিক ২৮,০০০ রোগী চিকিৎসিত হয় এবং অন্তর্বিভাগে প্রায় ২০০ জনের অধিক রোগী ভর্তি হয়।

(খ) রাজ্য সরকারি ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা মাত্র ১টি, নদীয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত 'স্টেট ফার্মাসিউটিক্যালস ল্যাবরেটরি ফর ইন্ডিয়ান মেডিসিন', যেখানে প্রায় ৫৪টির মতন আয়ুর্বেদ ঔষধচূর্ণ বটি সিরাপ ইত্যাদি ৮ রকম ফর্মে প্রস্তুত করা হয় এবং সমস্ত সরকারি আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্রে সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও ওই ক্যাম্পাসে একটি ভেষজ উদ্যান রয়েছে।

(গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের পরিকাঠামোগত অবস্থান—

- ২৯৬টি স্টেট আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারি, যেখানে বিগত ৩ বৎসরের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার জঙ্গলমহল, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ ইত্যাদি পর্ষদের মাধ্যমে প্রায় ৯৮ জন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করেছে। সঙ্গে ফার্মাসিস্ট ও অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ হয়েছে। এখনও ৫০টি পদ শূন্য রয়েছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে তা পূরণ করা হবে। স্টেট আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারিগুলিতে গড়ে বাৎসরিক প্রায় ৩০ হাজার রোগী চিকিৎসিত হয়।
- ১৮টি স্পেশালিটি ক্লিনিকে ৩৬ জন ডাক্তার এবং ৮টি স্পেশালিটি উইংয়ে ৮ জন ডাক্তার নিয়োগ হয়েছে। সঙ্গে অন্যান্য কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্য দপ্তরের আনুকূল্যে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ১৬০ জন আংশিক সময়ের ডাক্তার কাজ করেছেন। অনতিবিলম্বে আরও ১০০ জন ডাক্তার নিয়োগ হবে।
- রাষ্ট্রীয় বাল কল্যাণ যোজনা (স্কুল হেল্‌থ)-এর অধীনে ১৪০ জন ডাক্তার কাজ করেন। অনতিবিলম্বে সেই সংখ্যা ২৫০ জনেরও বেশি ছাড়িয়ে যাবে।

● জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে প্রায় ৩০ জন ডাক্তার কাজ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিল গঠন করেছেন। যার বর্তমান সভাপতি হলেন ডাঃ তুষার শীল। সরকারিভাবে একটি যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি কলেজ গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি

স্টেট ইউনানি কাউন্সিল পূর্বে গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে সেই কাউন্সিলকে নতুন করে গঠন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে একটি বেসরকারি ইউনানি মেডিকেল কলেজ আছে। কলকাতা ইউনানি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ৮/১, আব্দুল হালিম লেন, কলকাতা-১৬। আসন সংখ্যা ৫০।

পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি

বর্তমানে হোমিওপ্যাথি একটি কার্যকরী ও সুলভ সাশ্রয়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসাবে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হোমিওপ্যাথির বর্তমানের এই প্রতিষ্ঠা অতীতের কিছু বিশিষ্ট, গুণী ও মহান ব্যক্তিত্বের দীর্ঘমেয়াদি প্রচেষ্টার ফলাফল। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন পেশাদারি চিকিৎসক, তেমনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও আরও কিছু অন্য পেশার মানুষ যাঁরা পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ সাধক হিসাবে সুপরিচিত হয়েছিলেন।

আনুমানিক ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে, হোমিওপ্যাথির ভারতবর্ষে আগমন একজন জার্মান ভূতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসক ডাঃ হেনরি ওয়েস্টলি ভয়েসের হাত ধরে হয়। ইনি তাঁর সহকর্মী ভূতত্ত্ববিদের একটি দলের সঙ্গে কলকাতা শহরে পদার্পণ করেন। কলকাতা শহরে থাকাকালীন তাঁরা এই শহরের দরিদ্র মানুষজনকে ও তাদের নিজেদের ভারতীয় ভৃত্যদের প্রথম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করেন। এই প্রসঙ্গে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির ডাঃ মূলেনের নামও উল্লেখযোগ্য, যিনি একই সময়ে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বিতরণ করেন জনগণের মধ্যে।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে, আর একজন জার্মান, জন মার্টিন হোনিজবার্গার মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহের চিকিৎসা করেন ও তাঁকে সুস্থ করে তুলে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি প্রায় ১৮৬০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় বাস করেন ও সাধারণ মানুষের কাছে কলেরায় ধন্বন্তরী হিসাবে সুপরিচিত হন।

আনুমানিক ১৮৫২ সালে ভারতে মোট তিনটি হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়—একটি কলকাতায় ও বাকি দুটি তাঞ্জোর ও পাদুকোটায়। এর পরবর্তী সময়ে ভারতের হোমিওপ্যাথির ইতিহাসে যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—মিস্টার এড. ডি' লাটোর, মৌলবি জিয়াউদ্দিন হোসেন, ফোর্ট উইলিয়ামের ডাঃ কুপার ও ডাঃ রাদারফোর্ড রাসেল, কুলীবাজারের মিস্টার রাইপার, স্বনামধন্য ডাঃ টনেরি, ডাঃ বেরিগনি ও ডাঃ লেপোল্ড সালজার।

বাবু রাজেন্দ্রলাল দত্তকে ভারতীয় হোমিওপ্যাথির জনক বলা যেতে পারে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব প্রমুখ প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলে হোমিওপ্যাথিকে খ্যাতির আলোকে উজ্জ্বল করে তোলেন তিনি।

রাজেন্দ্রবাবু যদি ভারতীয় হোমিওপ্যাথির জনক হন তো, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকারকে তাঁর পালক বলতেই হবে। অ্যালোপ্যাথি জগতের সুশিক্ষিত চিকিৎসক হয়েও রাজেন্দ্রলাল দত্ত মহাশয়ের সাহচর্যে ও হোমিওপ্যাথির অত্যাশ্চর্য সারিয়ে তোলার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শীঘ্রই হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ অনুগামী হয়ে ওঠেন। কালক্রমে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (গলায় ক্যানসারের জন্য) প্রমুখের চিকিৎসা করে সুনাম অর্জন করেন। হোমিওপ্যাথির প্রচারের জন্য তাঁর বহু প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৬৮ সালে 'দ্য ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন'-এর প্রকাশ।

বাংলার যেসব কৃতী সন্তানরা হোমিওপ্যাথির নাম উজ্জ্বল করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতমরা হলেন—ডাঃ বিহারীলাল ভাদুড়ি, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ চন্দ্রশেখর কালি, ডাঃ অতুলকৃষ্ণ দত্ত, ডাঃ ডি. এন. রায়, ডাঃ ইউনান, ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ দে, ডাঃ শরৎচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ জ্ঞান মজুমদার, ডাঃ জে. এন. কাঞ্জিলাল, ডাঃ বি. কে. বোস, ডাঃ বি. কে. সরকার, ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী, ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী প্রমুখ।

চিকিৎসা জগতের ব্যক্তিত্বরা ব্যতীত হোমিওপ্যাথির প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন অন্যান্য পেশার আরও কিছু জ্যোতিষ্করা যাদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম।

এঁদের নিঃস্বার্থ ও নিরলস প্রচেষ্টাই হোমিওপ্যাথিকে জনমানসে একটি কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কালক্রমে হোমিওপ্যাথি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করে। সরকার সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করছে যাতে হোমিওপ্যাথি, আয়ুষ বিভাগের অন্তর্গত একটি চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

ভারতবর্ষ তথা রাজ্যের হোমিওপ্যাথির বর্তমান পরিকাঠামো এক কথায় বলা চলে দেশের তথা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ।

পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা ব্যবস্থা

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ৫টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ, হোমিওপ্যাথিক

পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কাউন্সিল

নিবন্ধীভুক্ত কার্যালয় : ১বি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট (চতুর্থ তল), কলকাতা-৭০০০০১
ক্যাম্পাস : ৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড (দ্বিতল), কলকাতা-৭০০০০৯
২৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৪।

পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন কাউন্সিল কর্তৃক **হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসি বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স** পড়ানো হয়।

সারণি-২
পশ্চিমবঙ্গের হোমিওপ্যাথিক কলেজসমূহ

কলেজের নাম	প্রতিষ্ঠানের প্রধান	দূরভাষ	ঠিকানা	হাসপাতাল দূরভাষ	ওয়েবসাইট	পাঠক্রম ও আসন সংখ্যা	
						স্নাতক	স্নাতকোত্তর
কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত							
● ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হোমিওপ্যাথি	ডাঃ এস. কে. নন্দা, বি.এইচ.এম.এস., এম.ডি. (হোম)	৯৪৩৩১৮৫৪০৯	ব্লক জি. ই., সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০১০৬		www.nih.nic.in	বি.এইচ. এম.এস. ১০০	এম.ডি. ৩৬
পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত							
● দি ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	অধ্যক্ষ ডাঃ কাজল ভট্টাচার্য (বি.এইচ.এম.এস.)	৯৪৩৩১২১৫০৪ ই-মেল : kaybee@rediffmail.com	২৬৩, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯	০৩৩ ২৩৫১ ৭৬৭৫	www.chmch.co.in	বি.এইচ. এম.এস. ৫০	
● ডি. এন. দে হোমিও-প্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	অধ্যক্ষ ডাঃ অখিলেশ খাঁ, বি.এইচ.এম.এস., এম.ডি. (হোমিওপ্যাথি)	৯৪৩৩৩৮৭৩৩৩ ই-মেল : akhileshkhan@gmail.com	১২, জি.কে. রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬ ৬৩, এ.পি.সি. রোড, কলকাতা-৭০০০০৯	০৩৩ ২৩২৮ ২৭১৪	www.dndehmch.org.in	বি.এইচ. এম.এস. ৫০	এম.ডি. ১২
● মহেশ ভট্টাচার্য হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	অধ্যক্ষ ডাঃ তারকনাথ ঘোষ, বি.এইচ.এম.এস., এম.ডি. (হোমিওপ্যাথি)	৯৪৩৩০৫৮৬২৭ ই-মেল : principalmbhmch@gmail.com	ড্রেনেজ ক্যানেল রোড, ডুমুরজোলা, হাওড়া-৭১১১০৪ ১নং জি.টি. রোড, হাওড়া-৭১১১০১	০৩৩ ২৬৭৭ ৪৪৪৯	www.principalmbhmch.wix.com/mbhmch	বি.এইচ. এম.এস. ৫০	এম.ডি. ৬
● মেদিনীপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (পশ্চিম মেদিনীপুর)	অধ্যক্ষ ডাঃ চপল ভট্টাচার্য, ডি.এম.এস., ডিপ.এন.এইচ.এইচ., এম.ডি. (হোমিওপ্যাথি)	৯৪৩৪২১৭০৯০ ই-মেল: mhmchospital@in.com	পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১	০৩২২ ২৭৫ ৩১১	www.mhmch.org	বি.এইচ. এম.এস. ৫০	
বেসরকারি কলেজ							
● প্রতাপ চন্দ্র মেমোরিয়াল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, কলিকাতা	অধ্যক্ষ ডাঃ বিধুভূষণ জানা, ডি.এম.এস.	৯৮৩১৯৩৮৯৩৭	১৪/১, মহানামব্রত সরণি (নারকেলডাঙা নর্থ রোড), কলকাতা-৭০০০১১	০৩৩ ২৩৫২ ৬৪৩৭		বি.এইচ. এম.এস. ৫০	
● মেট্রোপলিটন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল	অধ্যক্ষ ডাঃ ত্রিদিব চক্রবর্তী, ডি.এম.এস.	৯৪৩৩৪৬৬০২৮	রামচন্দ্রপুর, পোস্ট অফিস-সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০	০৩৩ ২৫৯৫ ১৮১৮		বি.এইচ. এম.এস. ৫০	
● নিতাইচরণ চক্রবর্তী হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (হাওড়া)	অধ্যক্ষ ডাঃ জয়দেব ঘোষ, ডি.এম.এস.	৯৪৩৩৯৮১৫৬৮	১০৬/১০৭, জয়নারায়ণ বাবু আনন্দ দত্ত লেন, হাওড়া, পিন-৭১১১০১	০৩৩ ২৬৫১ ৬৩৬৪		বি.এইচ. এম.এস. ৬০	
● খড়্গপুর হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (পশ্চিম মেদিনীপুর)	অধ্যক্ষ ডাঃ সি. আর. জানা, ডি.এম.এস.	৯৭৩৪৫৯২৫৪৮	কৌশল্য, পোস্ট অফিস-খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১০৩০১	০৩২২ ২৫৫৮৪৪		বি.এইচ. এম.এস. ৫০	

কলেজের নাম	প্রতিষ্ঠানের প্রধান	দূরভাষ	ঠিকানা	হাসপাতাল দূরভাষ	ওয়েবসাইট	পাঠক্রম ও আসন সংখ্যা	
						স্নাতক	স্নাতকোত্তর
● **বর্ধমান হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (বর্ধমান)**	অধ্যক্ষ ডাঃ পান্নালাল দে, ডিপ.এন.আই.এইচ., এম.ডি. (হোমিওপ্যাথি)	৯৪৩৩০০৩৩৮৮	নিমবার্ক ভবন, পোস্ট অফিস-রাজগঞ্জ, নতুনগঞ্জ, বর্ধমান, পিন-৭১৩১০২	০৩৪২ ২৫৩০৬০১		বি.এইচ. এম.এস. ৫০	
● **বীরভূম বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (বীরভূম)**	অধ্যক্ষ ডাঃ তপন চ্যাটার্জি, ডি.এম.এস.	৯৪৭৪৮৩২০২৫	সাঁইথিয়া, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৪			বি.এইচ. এম.এস. ৬০	
● **বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, আসানসোল**	অধ্যক্ষ ডাঃ আর. কে. মঙ্গল, ডি.এম.এস.	৯৪৭৪০০২১০২	ইসমাইল, পোস্ট অফিস-আসানসোল, জেলা-বর্ধমান, পিন-৭১৩৩০১	০৩৪১ ২৩০৫৮০		বি.এইচ. এম.এস. ৫০	

ডিগ্রি কোর্স (বি.এইচ.এম.এস.) পড়ার সুযোগ পাচ্ছে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী। এবং বেসরকারি আরও ৭টি হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজে ৩৭০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। কলেজগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপারে সরকারের সর্বদা সৎ প্রচেষ্টা বর্তমান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় স্বাস্থ্য পরিষেবা

জার্মানির ডাঃ ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান দীর্ঘ প্রায় ২২০ বছর আগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জীবনকালেই ইউরোপের গণ্ডি ছাড়িয়ে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন এই চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন তাঁরই ছাত্র ডাঃ মার্টিন হোনিজবার্গার। সেই থেকে বিভিন্ন চিকিৎসকের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যে শুধুমাত্র জনপ্রিয় হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন কঠিন রোগে কার্যকরী এই চিকিৎসা পদ্ধতি স্বাধীন ভারতবর্ষে নিজের সরকারি স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ১৯৭৩ সালে ভারত সরকার হোমিওপ্যাথিক সেন্ট্রাল কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়ন করে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পদ্ধতিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অন্তর্গত আয়ুষ বিভাগের অধীনে একটি স্বীকৃত চিকিৎসা ব্যবস্থার রূপ দেয়। এর আগে যদিও বিভিন্ন কলেজের মাধ্যমে হোমিওপ্যাথিতে ডি.এম.এস. ডিপ্লোমা প্রদান করা হত, কিন্তু এরপর থেকে হোমিওপ্যাথিতে ১৯৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এইচ.এম.এস. ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। পরবর্তী পদক্ষেপে কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি সরকারি জায়গায় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নিয়োগ শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭২ সালে প্রথম হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার নিয়োগ করে ও ১৯৯২ সালে চারটি বেসরকারি কলেজকে অধিগ্রহণ করে। সরকারি ক্ষেত্রে নিয়োগ এবং সুষ্ঠু পরিষেবার জন্য ২০০২ সালে আইন প্রণয়ন করে এই সব চাকুরিরত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকদের দুটি পৃথক ক্যাডারে ভাগ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্য পরিষেবা (WBHHS) এবং পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা পরিষেবা (WBHES)। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অন্তর্গত আয়ুষ বিভাগের ডিরেক্টরেট অব হোমিওপ্যাথির অধীনে এই দুই ক্যাডারের চিকিৎসকেরা স্বাস্থ্য ও হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিষেবা দিয়ে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকার অনুমোদিত স্থায়ী পদে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য নিয়োগ বোর্ড (WBHRB)-এর মাধ্যমে নিয়োগ হয়।

১. সহকারী নির্দেশক (অ্যাসিস্টেন্ট ডাইরেক্টর)—১টি পদ।

২. হোমিওপ্যাথিক পর্যবেক্ষক (ইনস্পেক্টার অব হোমিওপ্যাথি)—৪টি পদ।

৩. উপ-তত্ত্বাবধায়ক (ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট)—২টি পদ (২টি স্নাতকোত্তর কলেজ হাসপাতালের জন্য ১টি করে)।

৪. আবাসিক মেডিক্যাল আধিকারিক (রেসিডেনশিয়াল মেডিক্যাল অফিসার)—৬টি পদ (২টি স্নাতকোত্তর কলেজ হাসপাতালের জন্য ১টি করে এবং বাকি ২টি স্নাতক কলেজ হাসপাতালের জন্য ২টি করে)।

৫. হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার—৫৪৬টি পদ + ৭০টি নতুন অনুমোদিত পদ (২০১২-১৩ বর্ষে)।

সারা পশ্চিমবঙ্গে ৩০৫টি স্টেট হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারি (SDH), ১০৫টি ব্লক প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (BPHC) ও ১৩৫টি প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (PHC) এই পূর্ব অনুমোদিত ৫৪৫টি পদে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার কর্মরত। ৭০টি নতুন অনুমোদিত পদে এখনও নিয়োগ হয়নি। এই পদে বেতনক্রম ১৫৬০০-৪২০০০ ও গ্রেড পে ৫৪০০।

হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার ছাড়া স্টেট হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারিতে (SHD) ১টি হোমিওপ্যাথিক কম্পাউন্ডার-কাম-ড্রেসার (বেতনক্রম ৭১০০-৩৭৬০০, গ্রেড পে ৩২০০) এবং ১টি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর পদ অনুমোদিত আছে। প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (PHC) শুধুমাত্র ১টি হোমিওপ্যাথিক কম্পাউন্ডার-কাম-ড্রেসার পদের অনুমোদন আছে।

ব্লক প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টারের (BPHC) হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার সেখানকার তৃতীয় মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে নিযুক্ত থাকেন।

উপরোক্ত ৫৪৫টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারির গত বছরের রোগী পরিসংখ্যান সারণি-৪-এ দেওয়া হল।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবায় সরকার অনুমোদিত অস্থায়ী পদ—

১. গ্রাম পঞ্চায়েত ডিসপেন্সারি। মোট ৯৭৫টি ডিসপেন্সারির প্রতিটিতে আংশিক সময়ের ১ জন হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার (মোট বেতন ১৬০০০ টাকা) ও ১ জন হোমিওপ্যাথিক কম্পাউন্ডার-কাম-ড্রেসার (মোট বেতন ৮০০০ টাকা) নিযুক্ত আছেন। যদিও নতুন করে তৈরি ৩০০টি ডিসপেন্সারিতে কোনও হোমিওপ্যাথিক কম্পাউন্ডার-কাম-ড্রেসার পদের অনুমোদন নেই।

২. স্পেশালিটি ক্লিনিক (বিশেষ বহির্বিভাগ)—ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মোট ১৪টি ক্লিনিকের প্রতিটিতে পূর্ণ সময়ের চুক্তির ভিত্তিতে ১ জন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার (বেতনক্রম ১৫৬০০-৪২০০০), ১ জন হোমিওপ্যাথিক কম্পাউডার-কাম-ড্রেসার ও ১ জন এ.এন.এম. নিযুক্ত আছেন। ক্লিনিকগুলি হল :

- উলুবেড়িয়া সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, হাওড়া।
- বালুরঘাট সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, দক্ষিণ দিনাজপুর।
- ইমামবাড়া হসপিটাল, হুগলি।
- চাঁচল সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, মালদা।
- বনগাঁ সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, উত্তর ২৪ পরগনা।
- আসানসোল সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, বর্ধমান।
- জেলা হাসপাতাল, নদীয়া।
- বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, বাঁকুড়া।
- জেলা হাসপাতাল, কুচবিহার।

সারণি-৩
জেলাভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারি ও পঞ্চায়েত ডিসপেন্সারি

জেলা	স্টেট হোমিওপ্যাথিক ডিসপেন্সারি (SHD)	ব্লক প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (BPHC)	প্রাইমারি হেল্‌থ সেন্টার (PHC)	মোট	গ্রাম পঞ্চায়েত ডিসপেন্সারি
বাঁকুড়া	২০	১	৫	২৬	৬৮
বর্ধমান	১৭	২০	৮	৪৫	৭০
বীরভূম	১৬	১২	৭	৩৫	৫৭
কুচবিহার	১৫	১	১২	২৮	৪০
দক্ষিণ দিনাজপুর	৭	৪	৬	১৭	৩৩
দার্জিলিং	২৬	১	৪	৩১	৩০
হুগলি	১৯	৯	০	২৮	৫২
হাওড়া	১১	১০	৬	২৭	৪৭
জলপাইগুড়ি	২৩	৯	৪	৩৬	৪১
মালদা	১৫	১২	৯	৩৬	৫০
মুর্শিদাবাদ	১৫	৮	১০	৩৩	৭০
নদীয়া	১৬	৬	১০	৩২	৫৭
উত্তর ২৪ পরগনা	১৬	১	১	১৮	৬০
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৪	১	২	২৭	৭০
পূর্ব মেদিনীপুর	১৪	১	১৪	২৯	৬৩
পশ্চিম মেদিনীপুর	১৮	০	২১	৩৯	৮২
পুরুলিয়া	১৬	৫	১৫	৩৬	৫০
উত্তর দিনাজপুর	১০	৪	১	১৫	৩৫
কলকাতা	৭	০	০	৭	০
মোট	**৩০৫**	**১০৫**	**১৩৫**	**৫৪৫**	**৯৭৫**

- জে এন এন হসপিটাল, নদীয়া।
- রঘুনাথপুর সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, পুরুলিয়া।
- খড়্গপুর সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর।
- শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশনাল হসপিটাল, দার্জিলিং।
- জেলা হাসপাতাল, উত্তর দিনাজপুর।

৩. হোমিওপ্যাথি উইং (বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগ) ভারত সরকারের আয়ুষ বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মোট ৪টি উইং-এর প্রতিটিতে পূর্ণ সময়ের ২ জন হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল অফিসার (বেতনক্রম ১৫৬০০-৪২০০০), ১ জন হোমিওপ্যাথিক কম্পাউন্ডার-কাম-ড্রেসার, ১ জন জি. এন. এম. ও ১ জন এ. এন. এম. নিযুক্ত আছেন। উইংগুলি হল :

- জেলা হাসপাতাল, পূর্ব মেদিনীপুর।
- বহরমপুর জেনারেল হসপিটাল, মুর্শিদাবাদ।
- এমআর বাঙুর হসপিটাল, টালিগঞ্জ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
- জেলা হাসপাতাল, জলপাইগুড়ি।

৪. এনআরএইচএম হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক মোট ১০০টি ক্লিনিকে ১ জন করে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার (মোট বেতন ১১০০০ টাকা) নিযুক্ত আছেন।

৫. এছাড়াও রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রমে প্রায় ১৪০০ হোমিওপ্যাথ গত ২ বছরের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হয়েছে।

৬. ই.এস.আই.-এর অধীনে ৬টি হাসপাতালে প্রতিটিতে ১ জন হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসিস্ট শ্রম দপ্তর নিয়োগ করেছে। আরও

৭টি ই.এস.আই. হাসপাতালে চুক্তির ভিত্তিতে নতুন ৭টি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল অফিসার এবং ৭টি হোমিওপ্যাথিক ফার্মাসিস্ট পদে শীঘ্রই নিয়োগ হবে।

[সারণি-৩-এর জেলাগুলি ছাড়াও বর্তমানে আরও পাঁচটি স্বাস্থ্যজেলা তৈরি হয়েছে, যেগুলি হল—আলিপুরদুয়ার, আসানসোল, বসিরহাট, ডায়মন্ডহারবার ও ঝাড়গ্রাম।]

সরকারি ক্ষেত্রে উপরোক্ত পরিষেবা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই বিপুল জনপ্রিয় চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক কাউন্সিলের অধীনে মোট ২৮৮৫৯ জন রেজিস্টার্ড পার্ট-এ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ৭৯২৭ জন রেজিস্টার্ড পার্ট-বি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার (২৬.০৩.২০১৫ তারিখ অনুযায়ী) এবং ৩২৮ জন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার (০৮.০৪.২০১৫ তারিখ অনুযায়ী) রয়েছেন। এছাড়াও অন্য রাজ্যের ৩১০ জন হোমিওপ্যাথ এই রাজ্যের রেজিস্ট্রেশন নিয়েছেন।

এত কিছুর পরেও এই বলেই এই নিবন্ধ শেষ করতে হচ্ছে যে এখনও পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০০ জন মানুষ পিছু হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের সংখ্যা ৩, যা নিতান্তই তুচ্ছ।❑

[অধ্যাপক (ডাঃ) অখিলেশ খাঁ, অধ্যক্ষ, ডি.এন. দে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ডাঃ কাজল ভট্টাচার্য, রিডার ও অধ্যক্ষ, দি ক্যালকাটা হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ডাঃ পি.বি. কর মহাপাত্র, লেকচারার, জে.বি. রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ ও হাসাপাতাল, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।]

সারণি-৪
জেলাভিত্তিক রোগী সংখ্যা

জেলা	মোট ইউনিট	তথ্য জমা দিয়েছে এখন মোট ইউনিট	ইউনিট প্রতি মাসিক গড় রোগী সংখ্যা	বাৎসরিক গড় রোগী সংখ্যা
কলকাতা	৭	৬	৭২৬	৫২২৩৯
উত্তর ২৪ পরগনা	১৮	১৬	৮৩৮	১৬০৯০৬
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৭	২৩	৬৩৭	১৭৫৮৮০
হাওড়া	২৭	২৭	৩৬৮	১১৯৩২০
হুগলি	২৮	২৬	১১৩৪	৩৫৩৯৩৭
বর্ধমান	৪৫	৩২	৭০১	২৬৯০৬৮
পশ্চিম মেদিনীপুর	৩৯	৩৩	৯৬৮	৩৮৩৪৭৮
পূর্ব মেদিনীপুর	২৯	২৬	১১৩৩	৩২২১৯১
বাঁকুড়া	২৬	১৮	১৩৫৬	২৯২৮৬৩
পুরুলিয়া	৩৬	১৪	১২১১	২০৩৪৩৯
বীরভূম	৩৫	২৬	৬৭৮	২১১৫৪৪
মুর্শিদাবাদ	৩৩	২৫	৭৭৪	২৩২০৬২
নদীয়া	৩২	২৮	৫৮৪	১৯৬১১৯
মালদা	৩৬	২৫	৮৩৬	২৫০৭৫১
উত্তর দিনাজপুর	১৫	৭	৬০৪	৫০৭৩৮
দক্ষিণ দিনাজপুর	১৭	১১	১১৪২	১৩৭৪৯২
জলপাইগুড়ি	৩৬	১৯	১১২৪	২৩৩৪৯৬
কুচবিহার	২৮	৯	০	০
দার্জিলিং	৩১	১৫	৩৭১	৬৬৭৮০
মোট				**৩৭১২৩০৩**

"Winners don't do different things, They do things differently"

Md. Nazir Hossain

Rank-1 in Executive

Success Record in WBCS-2013			
Groups	PSC's Selection	Academicians	% of PSC's total Selection
Gr.-A	113	26	23%
Gr.-B	36	09	25%
Total	149	35	23.5%

Rank-1 in CTO

Soma Bhowmick

WBCS-2013 Gr. A & B: একটি মাত্র সেন্টার থেকে ৩৫ জন সফল

Md. Nazir Hossain, Rohed Shaikh, Subhankar Majumdar, Amartya Debnath, Renuka Khatun, Soumen Banik, Shayan Ahmed, Md. Mafidul Islam, Sambiti Chakrabarty, Dipanjan Bhattacharjee

Executive (Rank-1), Executive (Rank-4), Executive, Executive, Executive, Executive, DSP (Rank-5), DSP, DSP, DSP

Chandan Das, Dibakar Das, Md. Badiuzzaman, Ripan Baul, Soma Bhowmick, Jaydeep Chakraborty, Md. Afroz Alam, Nilanjana Das, Soma Senapati, Abhishek Boliar

DSP, DSP, DSP, DSP, CTO (Rank-1), CTO, CTO, CTO, CTO, CTO

২০১৫ এর প্রিলিতে আমাদের ডব্লুবিসিএস অফিসারদের দ্বারা সম্পাদিত নোট থেকে ১০০ শতাংশ এবং আমাদের মকটেস্ট থেকে ৫৫ শতাংশ কমন। মেনসের মকটেস্ট (VST) জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে।

Mahwish Paikar, Nakshatra Roy, Moni Shankar Naskar, Saumyadeep Ghosh, Utpal Baidya, Suman Kr. Mondal, Anshuman Baidya, Kausik Mandal, Sanjay Show, Prasenjit Saha

CTO (1st Attempt), CTO, CTO, Food & Supply, Food & Supply, Food & Supply, Food & Supply, Food & Supply, ADSR, ADSR

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

☑ প্রিলি-২০১৬ এর নতুন ব্যাচ শুরু হতে চলেছে। ☑ মেনস-২০১৫ এর পরীক্ষার্থীদের জন্য মেনস ক্লাব চালু আছে। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন নিম্নলিখিত নম্বরে। ☑ প্রিলি ও মেনসের জন্য পোস্টাল কোর্স চালু আছে।

Sagar Mondal

ADSR

স্থানাভাবে সব ছবি দেওয়া গেল না

নতুন সিলেবাস অনুযায়ী ১০০ শতাংশ নির্ভরযোগ্য 'Inclusive Mains Batch' সবে শুরু হয়েছে। আসনসংখ্যা সীমিত। এখনও ভর্তি চলছে।

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

✆ 9830770440
✆ 9674478644

Website: www.academicassociation.in ▪ Centre: Uluberia-9051392240 • Birati-9674447451 • Darjeeling-9832041123

কৃষিতে অ্যান্টিবায়োটিক ও বিকল্প ভাবনা

কৃষিতে অ্যান্টিবায়োটিকের লাগামছাড়া ব্যবহার (এবং দায়িত্বহীনভাবে তা যেখানে সেখানে ফেলে জমির ক্ষতি করে) ফসল ও ফল-সবজি, পশু-পাখি, মানুষ তথা পরিবেশের কতটা ক্ষতি করছে সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। কেন ও কীভাবে ক্ষতি করে এই অ্যান্টিবায়োটিক আর ক্ষতিই যদি করে তবে তা ব্যবহৃত হয় কেন? এর বিকল্প কিছু আছে কী—এ সমস্ত কিছু সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করছেন **ড. সগর মৈত্র।**

কৃষি বলতে কেবলমাত্র ফসল চাষই বোঝায় না, ব্যাপক অর্থে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি গোপালন, পোলট্রি, মৌমাছিপালন, মাছচাষ, রেশমচাষ, লাক্ষাচাষ প্রভৃতি সহায়ক ও পরিপূরক কর্মগুলোকেও বোঝায়। এই সব বিভিন্ন কৃষিকর্মে ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য উপাদানের মতো ব্যবহৃত হয় অ্যান্টি-বায়োটিক। তবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার প্রাণীপালনে ও পোলট্রিতে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

প্রায় ছয় দশক ধরে চলতে থাকা একটি ব্যবস্থা হঠাৎ করেই আমাদের দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এল। এর প্রেক্ষাপটে রয়েছে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের (CSE) একটি রিপোর্ট। এই সংস্থাটি দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা থেকে ব্রয়লার মুরগির মাংসের নমুনা সংগ্রহ করে। সেই নমুনায় পাওয়া যায় কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ। অর্থাৎ মুরগির মাংস যাঁরা খেয়ে থাকেন, তাঁরা অজান্তে খেয়ে চলেছেন এই সব অ্যান্টিবায়োটিক। আমাদের দেশে মোট ব্যবহৃত মাংসের ৫০ শতাংশেরও বেশিটা হল মুরগির মাংস। প্রসঙ্গত, মানুষের দেহে বাড়ছে নির্দিষ্ট কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা। ফলে রোগ নিরাময়ের জন্য যখন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে, তা আর কাজ করছে না। CSE-র রিপোর্টকে উদ্ধৃত করে লোকসভায় জিরো-আওয়ারে আলোচনা হয় (১২ আগস্ট, ২০১৪)। সংবাদ মাধ্যমে শিরোনাম হয়ে যায় বিষয়টি।

CSE-র আরেকটি অনুসন্ধান (২০১০) অবশ্য আগেই আমাদের জানিয়েছিল যে, আমাদের দেশের বাজারে লভ্য মধুতে অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি, তবে তা বেশ কম পরিমাণে। একথা সত্যি যে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ মাংসে, দুধে বা অন্য কোনও প্রাণীজাত পদার্থে রয়ে যাওয়ার মানেই হল পরোক্ষভাবে মানুষের বিপত্তি, স্বল্প মাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে তা নিতে নিতে মানুষের দেহে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ ক্ষমতা। সম্প্রতি লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান যে, ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশে বিভিন্ন ওষুধ প্রতিরোধী (মাল্টি-ড্রাগ রেসিস্টেন্ট) যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা পাঁচগুণ বেড়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের পরিসংখ্যান (২০১১) অনুযায়ী, ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগের প্রকোপ কিন্তু বিশ্বের মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি। কেবলমাত্র নিউমোনিয়াতেই প্রতি বছর এ দেশের চার লক্ষ দশ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।

এই রকম পরিস্থিতিতে সকলেই চাইবেন, কৃষি ও সংলগ্ন বিষয়ে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বন্ধ হোক। কিন্তু হঠাৎ করে বন্ধ করলে তো চলবে না, প্রাণীপালক তথা কৃষকদের হাতে পৌঁছে দিত হবে এর বিকল্প। কারণ, মনে রাখতে হবে এখনও আমাদের দেশের জিডিপি-তে কৃষি ও তার সহায়ক কর্মগুলির অবদান ১৩.৭ শতাংশ। ভারতে পোলট্রি শিল্পের বর্তমান অর্থমূল্য ৫৫ হাজার কোটি টাকার মতো, এর মধ্যে বড় অংশটাই বিস্তৃত অসংগঠিত ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মুক্তাঙ্গন পোলট্রি পালনের আঙিনায়।

কীভাবে এল অ্যান্টিবায়োটিক? আর কীভাবেই-বা তা প্রবেশ করল পোলট্রি, প্রাণীপালন, মাছচাষ ও অন্যান্য কৃষিকর্মের আঙিনায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখা যাক। ১৯২৮ সালে আলেক্সান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেন। শুরু হল অ্যান্টিবায়োটিকের পথচলা। বাণিজ্যিকভাবে পেনিসিলিন উৎপাদন করলেন হাওয়ার্ড ফ্লোরে এবং আর্নেস্ট চেইন, ১৯৪২ সালে। কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে তিন জন বিজ্ঞানীই যৌথভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৪৫ সালের ১১ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার নেওয়ার সময় বক্তৃতায় ফ্লেমিং দিয়েছিলেন এক সতর্কবাণী : "..... the ignorant man may easily under-dose himself and by exposing his microbes to non-lethal quantities of the drug make them resistant।" বিগত শতাব্দীর চারের দশকের শেষ দিক থেকেই দেখা যায়, শূকর ও মুরগির দেহে অ্যান্টিবায়োটিক বৃদ্ধি সহায়কের ভূমিকা পালন করতে থাকে। এইভাবে প্রাণীপালনে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রবেশ ঘটে, মাছের খাদ্যেও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল মেশানো এক নিয়মিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়, তবে তা কম মাত্রায় (সাব-থেরাপিউটিক)। ক্রমশ এর উপকার দিকগুলো প্রকট হওয়ার পরে মাত্রা বাড়ানোর ঝোঁক দেখা যায়।

যতই বৃদ্ধি সহায়কের গুণ থাক না কেন, কম মাত্রায় দীর্ঘ সময় ধরে খাদ্য বা জলের মাধ্যমে অ্যান্টিবায়োটিক প্রাণীর দেহে প্রবেশ

করানো (সাব-থেরাপিউটিক) এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য আগাম প্রয়োগ (প্রোফাইল্যাকটিক)—এই দুইয়ের মানে হল, ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা। ধারাবাহিকভাবে এই সব ওষুধ খাওয়ানোর ফলে যেটা হয়, প্রাণীর মল-মূত্র বা তা থেকে তৈরি হওয়া জৈব সারের মাধ্যমে এগুলি মাটি ও জলের মধ্যে এসে যায়, ঢুকে পড়ে কৃষি বাস্তুতন্ত্রে। অণুজীবী বিরোধী বৃদ্ধি সহায়ক (অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল গ্রোথ প্রোমোটারস বা AGPs)-এর ব্যবহার প্রাণীর ও পোলট্রির বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল। মজার বিষয় হল, আইন অনুযায়ী রোগ চিকিৎসার জন্য অর্থাৎ 'থেরাপিউটিক' ব্যবহারের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে হলে পঞ্জীকৃত চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন দরকার, কিন্তু বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে ব্যবহারের জন্য কিছুই লাগে না। তার মানে হল যে কোনও ব্যক্তি তাঁর পছন্দমতো অ্যান্টিবায়োটিক যতটা পরিমাণে চাইবেন, কিনতে পারেন।

প্রসঙ্গত, কেবলমাত্র মাছ ও অন্যান্য জলজীব চাষ, পোলট্রি, প্রাণীপালন, মৌমাছিপালন প্রভৃতি কৃষির সহায়ক এবং পরিপূরক কর্মেই নয়, বিভিন্ন ফসল চাষের ক্ষেত্রেও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। আলু, বেগুন, লঙ্কা, টম্যাটো, ধান, লেবু-সহ বিভিন্ন ফল প্রভৃতি ফসলের ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ নিয়ন্ত্রণে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, অক্সোলিনিক অ্যাসিড, জেন্টামাইসিন, স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন, কাসুগামাইসিন, ভ্যালিডামাইসিন প্রভৃতির ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে বীজ বা চারাশোধন এবং রোগাক্রান্ত ফসলে অ্যান্টিবায়োটিকের জলীয় দ্রবণ স্প্রে, এই দুটি পন্থা অবলম্বন করা হয়। জমিতে দাঁড়ানো ফসলে যখন অ্যান্টিবায়োটিকের জলীয় দ্রবণ প্রয়োগ করা হয়, তখন তা মাটিতেও পড়ে এবং এইভাবে কৃষি বাস্তুতন্ত্রে মিশে থাকে। বীজশোধন করলে সেই সম্ভাবনা নেই। কোনও ফসলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের পরে তার অবশেষ শেষ পর্যন্ত ফসলে কতটা রয়ে যায়, সে বিষয়ে তেমন কোনও ভয়াবহ তথ্য পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, এই সব ফসল চাষে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ খুবই সীমিত।

প্রাণীপালন, মাছচাষ, পোলট্রি—এই সব কৃষিকর্মে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার শুরু হওয়ার পর থেকে বেশ ঠিকঠাকই চলছিল। বিপত্তি বাধল প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হওয়ার বিষয়টি নজরে আসার পরে। ১৯৬০ সালে মেথিসিলিন নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা স্টেফাইলোকক্কাস অরিয়াস ব্যাকটেরিয়ার (যা নিউমোনিয়া, সেপ্টিসেমিয়া প্রভৃতি রোগ ঘটায়) সংক্রমণের বিরুদ্ধে এটি অকার্যকরী হয়ে ওঠে। এই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়াটির প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে ফ্লুওরোকুইলোনস্ উদ্ভাবিত হয় এই জীবাণুর মোকাবিলায়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে স্টেফাইলোকক্কাস-এর বেশিরভাগ স্ট্রেনই এই নতুন অ্যান্টিবায়োটিকটির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে ফেলে। শুধু এই দুটো নয়, সেই সময়কার প্রচলিত অধিকাংশ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেই এই ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। সারা দেশ জুড়ে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। বারাণসীতে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এর গবেষণায় দেখা গেল, এই ব্যাকটেরিয়ার দুটো স্ট্রেন এতটাই শক্তিশালী যে, এর প্রতিকারে ভ্যানকোমাইসিন, যা ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে এতদিন চিহ্নিত ছিল, এরা তা-ও হজম করে ফেলছে।

এর পর থেকেই সারা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়ে যায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে অল্পমাত্রায় বা সাবথেরাপিউটিক ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের উপভোক্তারা পোলট্রি, প্রাণীজাত খাদ্য, মাছ ও জলজীবের বিষয়ে অনাগ্রহ দেখাতে থাকেন। এর ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন (WHO), আমেরিকান পাবলিক হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন প্রাণীখাদ্যে মেশানো এবং বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে প্রাণীকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানোর বিরোধিতা করে। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন ভারতকে সতর্ক করে। তারপরে আমাদের দেশেও তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল এবং ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রক প্রাণীখাদ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহার বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ পাঠায়।

আজকের দিনে অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ক্ষমতা গড়ে ওঠার কারণে শুধুমাত্র কৃষি ও তার সহায়ক বৃত্তিগুলোকে খলনায়ক বানানোর কোনও মানে হয় না। মানুষের রোগ নিরাময়ে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক, যেভাবে ব্যবহার করা হয়, সেখানেও লক্ষ করা যায় সীমাবদ্ধতা। গ্রামে-গঞ্জে-মফস্সলে কোনও ওষুধের দোকান থেকে ওষুধ কিনতে হলে প্রেসক্রিপশন দেখানো বাধ্যতামূলক নয়। রোগী অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই নিজে নিজে ডাক্তারি করে থাকেন, ভালো মন্দ না বুঝেই অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে থাকেন। হাতুড়ে (বা কোয়্যাক) ডাক্তারেরা (চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁদের জ্ঞান সীমিত) দ্রুত ও নিশ্চিত রোগ সারানোর তাগিদে, নিজের নাম-যশ বাড়ানোর প্রয়োজনে সাধারণ রোগের নিরাময়েও দিয়ে থাকেন অ্যান্টিবায়োটিক। আবার পাশ-করা পঞ্জীকৃত চিকিৎসকেরাও অনেক সময় ধরে নেন যে, রোগী হয়তো কম শক্তিশালী, পুরানো ও সাধারণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী, তাই তিনি চিকিৎসার শুরুতেই অতি শক্তিশালী, আধুনিকতম এবং/অথবা ব্রড স্পেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ব্যবহার করেন। এসবের পরিণামও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া।

মাছ ও অন্য জলজীব (চিংড়ি, কাঁকড়া প্রভৃতি) চাষে যে পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তার ৭০-৮০ শতাংশ অব্যবহৃত রয়ে যায়। এগুলি জলজ পরিবেশে রয়ে যায়। প্রাণী ও পোলট্রি খাদ্যে ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের ৩০-৮০ শতাংশ অব্যবহৃত থাকে। প্রাণী বা মুরগির বর্জ্য সরাসরি যখন কৃষিজমিতে যুক্ত হয় বা রূপান্তর ঘটিয়ে জৈবসার বা কম্পোস্ট সারে পরিণত করে কৃষিজমিতে ব্যবহার করা হয়,

তখন সেই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো মিশে যায় চাষের জমিতে, ভৌম জলে এবং কৃষি বাস্তুতন্ত্রে। তাছাড়া প্রাণী বা পোলট্রি খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ যা প্রাণীরা অপচয় করে, তা সরাসরি ফেলে দেওয়া হয় সার-গাদায় এবং সেখান থেকে এগুলির ঠাঁই হয় ফসলের জমিতে। অবশিষ্ট এই অ্যান্টিবায়োটিক অবিকৃত অবস্থায় বা বিপাকীয় রূপে (মেটাবোলাইট) প্রকৃতিতে মিশে যায়। ফসলের জমিতে মিশে যাওয়ার পরে এগুলোর বিরূপ প্রভাব দেখা যায় মাটিতে বসবাসকারী উপকারী অণুজীবের ওপরে। এছাড়া আরেকটি ক্ষতি, সেটি হল ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী স্ট্রেন-এর উদ্ভব, যা মানুষ-প্রাণী-পাখি সকলের কাছেই বিপজ্জনক।

এখানে বলা দরকার, পোলট্রি বা প্রাণীপালন বা মাছচাষ বা ফসল উৎপাদন—কোনও একটি নির্দিষ্ট কৃষিকর্ম কিন্তু এককভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য দায়ী নয়। আসলে আজকে যে কুফলগুলো উঠে এসেছে এবং যা নিয়ে শোরগোল হচ্ছে, তা তো একদিনে হয়নি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় ছয় দশক ধরে চলতে থাকা একটি ব্যবস্থা বর্তমান সময়ে 'অ-ব্যবস্থা' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এখন কৃষি বাস্তুতন্ত্রে মিশে গিয়েছে অ্যান্টিবায়োটিকের অবশেষ। মনে রাখতে হবে, ভারতের মতো বড়, জনবহুল, বৈচিত্রপূর্ণ, কৃষিপ্রধান ও উন্নয়নশীল দেশে সমস্ত ব্যবস্থাটা কিন্তু প্রশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। তাহলে এখন কী করণীয়? এই রকম পরিস্থিতিতে যে কোনও সংবেদনশীল মানুষেরই মনে হতে পারে যে, গাছের রোগ নিবারক হিসাবে এবং প্রাণীপালনে বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে বা খাদ্যের গুণমান বৃদ্ধিকারক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার এখুনি বন্ধ করতে পারলে বোধ হয় প্রাণীর স্বাস্থ্য, বিকাশ, খাদ্য, পরিবেশ তথা কৃষি বাস্তুতন্ত্রের নিরাপত্তা, উৎপাদন প্রক্রিয়ার গুণগত উন্নয়ন, উৎপন্ন পদার্থের গুণমান বৃদ্ধি প্রভৃতি একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে। নিঃসন্দেহে তাই! তবে একইসঙ্গে লক্ষ রাখা দরকার, উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে যেন কোনও আঘাত না আসে। কেননা জনবহুল এই দেশে ছোট ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে রয়ে গিয়েছেন অনেক মানুষ, যাঁদের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি বা এর সহায়ক কর্ম বা এগুলোর প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদন বা উৎপাদিত পণ্যের প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত। কোনও হঠকারী সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে এঁদের অসুবিধায় ফেলবে। তাই আগে-পিছে চিন্তা করে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রাণীপালনে বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে ও খাদ্যের গুণমান বৃদ্ধিকারক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হলে এর বিকল্পগুলোকে তুলে আনতে হবে। বিকল্প আছে। নীচে সেই বিকল্পগুলোর উল্লেখ করা হল।

ভেষজ

বিভিন্ন গাছগাছড়ার পাতা, ফুল, ফল, শিকড়, বীজ, ছাল-বাকল—এসবই হল ভেষজ উপাদান। এরকম অনেক উদ্ভিদ রয়েছে, যার জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে তৈরি পণ্য রোগ নিরাময়ে বা বৃদ্ধি সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন ও অ্যাজিন যা ব্রড স্পেক ট্রাম অ্যান্টিবায়োটিকের সমতুল্য এবং এগুলি যকৃতের কোলেস্টেরল কমায়, বুক ও উরুর মাংসপেশির বৃদ্ধি ঘটায়। স্প্যানিশ ড্যাগার (ইউকা শাইডিগেরা) নামে একটি গাছ রয়েছে, যা থেকে মানুষের চিকিৎসার নানারকম ওষুধ তৈরি হওয়া ছাড়াও পোলট্রিতে ব্যবহৃত হয়। মুরগির পরিবহণজনিত ধকল রোধে, স্বাস্থ্যহানি ঠেকাতে, ডিমের উৎপাদন বাড়াতে এবং অন্ত্রের ক্রিয়াকর্ম ঠিক রাখতে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নানারকম অসুখের নিরাময়ে নিম, তুলসী, বাসক, অশ্বগন্ধা প্রভৃতি থেকে তৈরি হওয়া ভেষজ ওষুধ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এই সব ভেষজ বিকল্পের সন্ধানে আরও গবেষণা যেমন প্রয়োজন তেমনি দরকার এগুলির সুলভ জোগান।

প্রিবায়োটিকস

প্রিবায়োটিকস হল ওলিগোস্যাক্কারাইড ও মনোস্যাক্কারাইডের সংক্ষিপ্ত শৃঙ্খল, যা প্রাণীখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এটি সয়াবিন ও সরষে ব্যবহার করে তৈরি করা প্রাণীখাদ্যে লভ্য থাকে। এছাড়া ডালশস্য, তন্ডুলশস্য ও ঈস্টের কোষ-প্রাচীরে নির্দিষ্ট প্রকারের ওলিগোস্যাক্কারাইড থাকে। পাচনতন্ত্রে যেসব অণুজীব থাকে তাদের সক্রিয়তা ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে প্রিবায়োটিকস। আর তার ফলে পাচনক্রিয়ার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। এই পদার্থগুলো সহজপাচ্য। এগুলো মুরগির অন্ত্রে ক্ষতিকর জীবাণুর সংখ্যা কমায়। শূকরের দেহে ওলিগোস্যাক্কারাইড সাইটোকিনের ক্ষরণ বাড়ায়, এর ফলে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার মোকাবিলা করা সহজ হয়।

প্রোবায়োটিকস

পরিপূরক খাদ্য হিসাবে বিভিন্ন জীবন্ত অণুজীব অর্থাৎ প্রোবায়োটিকস ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলি অন্য ডায়রেক্ট ফিড মাইক্রোবিয়ালস (DFMs) হিসাবেও পরিচিত। এগুলি পানীয় জল বা খাদ্যের সঙ্গে খাওয়ালে প্রাণীর অন্ত্রে বসবাসকারী অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এর ফলে অপকারী জীবাণুর সংখ্যা কমে এবং এইভাবে এগুলি প্রাণীর বৃদ্ধি ও উৎপাদনে সহায়তা করে। প্রোবায়োটিকস হিসাবে যেসব জীবন্ত অণুজীবগুলো ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হল—ল্যাকটোব্যাসিলি, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, বিফিডো-ব্যাকটেরিয়া, ব্যাসিলাস, পেডিওকক্কাস, লিউকো-নস্টক, প্রোপিওনি-ব্যাকটেরিয়াম প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়া, একপ্রকার ঈস্ট (স্যাকারোমাইসি সেরেভেসি) এবং অ্যাসপারজিলাস অরাইজির মতো ছত্রাক। প্রোবায়োটিকস দৈনিক এক থেকে দুইবার খাওয়ানো হয়। পোলট্রি ও শূকর পালনে এর ব্যবহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত।

জৈব অ্যাসিড/অ্যাসিডিফায়ার

উদ্ভিদ ও প্রাণীকলায় স্বাভাবিক নিয়মেই জৈব অ্যাসিড থাকে। এগুলি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। দীর্ঘকাল ধরেই খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্য জৈব অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাণীখাদ্য প্রস্তুতিতে সাধারণত দুই ধরনের অ্যাসিডিফায়ার ব্যবহার করা হয়। একপ্রকার অ্যাসিডিফায়ার প্রাণীখাদ্যের pH কমায় এবং খাদ্যে

ক্ষতিকারক ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে। সালমোনেল্লা নামক ক্ষতিকারক জীবাণুর প্রতিরোধে জৈব অ্যাসিড মিশিয়ে পোলট্রি-খাদ্য পরিশোধন করা হয়। আরেক প্রকার অ্যাসিডিফায়ার (সেগুলিও খাদ্যে মেশানো হয়) প্রাণীর পাকস্থলী ও অন্ত্রের অম্লতা বজায় রাখে। এর ফলে প্রাণীর খাদ্যগ্রহণ, বৃদ্ধি ও খাদ্যকে অর্থনৈতিক পদার্থে রূপান্তর (FCR) বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে দেখা গেছে, প্রাণীর পাকস্থলীতে ও অন্ত্রে ক্ষতিকারক জীবাণুর সংখ্যা হ্রাস পায়।

অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট

প্রাণীদেহে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু স্বাভাবিক জারণের ফলে ক্ষতিকারক ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস উৎপন্ন হয়, যেগুলি শরীরের বিভিন্ন কোষ ও কলার ক্ষতি করে। প্রাণীখাদ্যে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট মিশিয়ে গড়ে তোলা হয় এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টগুলো ক্ষতিকারক ফ্রি-র‍্যাডিক্যালস-কে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যেসব অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টগুলো সচরাচর পোলট্রি খাদ্যে তথা প্রাণী খাদ্যে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হল—β-ক্যারোটিন, ভিটামিন এ, ই, সি, ইথোক্সিকুইন, লেসিথিন, বিউটাইলেটেড হাইড্রোক্সিটোউলিন (BHT), প্রোপাইল গ্যালেট, বিভিন্ন চিলেটেড ধাতব আয়ন প্রভৃতি।

উৎসেচক

প্রাণীর হজম ও বিপাকীয় ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে উৎসেচক (এনজাইম) ব্যবহার করা যেতে পারে। পোলট্রি ও প্রাণীর শরীরে যে উৎসেচক থাকে, সেগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়া সত্ত্বেও পাকস্থলীতে কিছু খাদ্য অপাচ্য অবস্থায় রয়ে যায় (যেমন নন-স্টার্চ পলিস্যাক্কারাইড), যা রেচন পদার্থ হিসাবে বেরিয়ে আসে। কিন্তু বাইরে থেকে যদি অতিরিক্ত উৎসেচক খাদ্যের মাধ্যমে জোগান দেওয়া যায়, তাহলে, প্রাণীর পাকস্থলীতে অপাচ্য খাদ্যের পরিমাণ কমে। এর অর্থ হল প্রাণী যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে, তার বেশিরভাগ-টাই হজম হয়ে যায় অর্থাৎ বেশি পরিমাণে বিপাকীয় শক্তি উৎপন্ন হয়, যা প্রাণী বৃদ্ধি সহায়ক হয়ে থাকে। এখন প্রাণীখাদ্যে আলাদা করে উৎসেচক মেশানো প্রায় একটা প্রথা হয়ে গিয়েছে। যেসব উৎসেচকগুলো মেশানো হয়, সেগুলো হল—অ্যামাইলেজ, অ্যারাবিনেজ, সেলুলেজ, গ্লুকানেজ, হেমিসেলুলেজ, পেকটিনেজ, জাইল্যানেজ, প্রেটিয়েজ, লাইপেজ, এস্টারেজ, ফাইটেজ ট্যানেজ প্রভৃতি।

ফসল চাষের ক্ষেত্রে, গাছের ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ নিবারণে ধূপক বিষ প্রয়োগের দ্বারা মাটিকে জীবাণুমুক্ত করা এবং উপকারী জীবাণুঘটিত রোগনাশক (যেমন, সিউডোমোনাস ফ্লুওরোসেন্স, ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি প্রভৃতি) ব্যবহার করে মাটিতে বসবাসকারী উপকারী জীবাণু সংখ্যাবৃদ্ধি করার মতো প্রায়োজনীয় ব্যবস্থাগুলোর ওপরে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাণীপালনের ক্ষেত্রে বিকল্পগুলোর ব্যবহার ও জোগান সীমিত। আগামী দিনে যদি এই সব বিকল্পের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে এগুলির জোগানও বাড়বে। একেবারে হঠাৎ করে নয়, ধাপে ধাপে অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবহারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। সরকারি বিধিনিষেধ আরোপ যেমন করতে হবে, তেমনি প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে কৃষি ও সহায়ক কর্মে অংশগ্রহণকারী সকলকেই। সময়ের সাপেক্ষে স্থির করতে হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য, আর তা হল : প্রাণীপালন ও কৃষির সহায়ক কর্মে অ্যান্টিবায়োটিকের সাব-থেরাপিউটিক এবং প্রোফাইল্যাকটিক ব্যবহার বন্ধ করা। উপভোক্তা বা সাধারণ মানুষের সচেতনতাও দরকার। তাহলেই আমরা গড়ে তুলতে পারব এক পরিবেশ-বান্ধব (বরং বলা যেতে পারে, নিয়ন্ত্রিত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সংবলিত) এক টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা।❑

[লেখক কৃষিবিদ।]

উল্লেখপঞ্জি :

Centre of Science and Environment. 2014. Latest study by CSE's Pollution Monitoring Lab finds antibiotic residues in chicken. Available at : http://www.cseindia.org/node/5487

Das Soma & Madhvi Sally. 2014. Centre directs state governments to stop the use of antibiotics and hormones in animal feed. ET Bureau Jun 9, 2014. Available at: http://articles.economictimes,indiatimes.com/2014 06-09/news.

Global Antibiotic Resistance Partnership (Garp)-India Working Group. 2011. Rationalizing antibiotic use to limit antibiotic resistance in India. Indian J Med Res 134 : 281-294.

NAAS 2010. Antibiotics in Manure and Soil—A Grave Threat to Human and Animal Health. Policy Paper No. 43, National Academy of Agricultural Sciences, New Delhi pp 20. Available at:http://www.naasindia.org.

Paliwal Ankur and Singh Jyotsna. 2014. Hatching superbugs. Down to Earth. August 15, 2014. Available at: http//www.downtoearth.org.in.

Stockwell V.O. & Duffy B. 2012. Use of antibiotics in plant agriculture. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 31(1), 199-210. Available at: http://www.oie.int/doc/ged/D11800.PDF

Times News Network. 2010. Antibiotics in most honey brands: Study. The Times of India. 2010 September 16. Available at: http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-09-16/india.

World Health Organization. 2011. World Health Statistics 2011.

সংস্কার : বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও বিকাশের চাবিকাঠি

অর্থনৈতিক বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ। কিন্তু দুর্বল পরিকাঠামো ও লাল ফিতের ফাঁসের দুর্নাম না ঘুচলে এ দেশের পক্ষে লগ্নিকারিদের আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। সংস্কারের মাধ্যমে কীভাবে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করা হচ্ছে আলোচনা করছেন **প্রভাকর সাহু** ও **অভিরূপ ভুঁইয়া**।

গত সাধারণ নির্বাচনের কয়েক বছর আগে থেকেই লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতি, আর্থিক বিকাশের শ্লথগতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতি পঙ্গুত্বের ফলে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হারানো—সব মিলে পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে পড়ে যে নতুন সরকারের কাছে ভারতীয় শিল্পমহল, বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেকখানি বেড়ে যায়। নতুন সরকার তাদের সমস্যার বোঝা লাঘব করবে, বেহাল অর্থনীতিকে দিশা দেখাবে—এটাই ছিল সকলের প্রত্যাশা। মানুষের এই প্রত্যাশা পূরণে সরকারও এগিয়ে এসেছে। ঘরোয়া বিনিয়োগকে আবার চাঙ্গা করে তোলা, ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ অনুকূল ও মসৃণ করা, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এ দেশে বিনিয়োগে আহ্বান জানিয়ে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানকে সফল করে তোলার জন্য সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে—যাতে এই দেশ উৎপাদনশিল্প-কেন্দ্রিক কর্মসংস্থান ও বিকাশের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। গত এক বছরে উন্নত প্রশাসন, আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত রেখেছে নতুন সরকার। তা সত্ত্বেও একশো কোটি মানুষের এখনও অনেক স্বপ্নপূরণ বাকি। গত এক বছরে নীতিগত ক্ষেত্রে সরকার যে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে যে সাফল্য পেয়েছে তা এই নিবন্ধে তুলে ধরা হল।

বাণিজ্যের পরিবেশ অনুকূল করে তোলার উদ্যোগ

এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সরকার একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। বিজেপি যখন বিপুল জনাদেশ নিয়ে দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পায় তখন ১৬ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আটকে ছিল। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে সরকারের নীতি পঙ্গুত্ব এবং মান্ধাতার আমলের কর নীতি বিনিয়োগকারীদের মনে বিরূপ ধারণা ও আশঙ্কার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু নতুন সরকার নতুন আইন প্রণয়ন, পুরনো আইন সংশোধন, নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি তথা বাজেটে নতুন ব্যবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে লগ্নিকারির আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করেছে। তবে এই কয়েক মাসের মধ্যেই নাটকীয়ভাবে লগ্নির অঙ্ক আকাশ ছুঁয়েছে এমনটা দাবি অবশ্য করা যায় না। কিন্তু সরকারি হিসাবে ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে মূলধন সৃষ্টির হার ৪.১ শতাংশ বেড়েছে। বাণিজ্যের পরিবেশ সহজ-সরল করার জন্য সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে ভোডাফোন ইন্ডিয়ার সঙ্গে কর সংক্রান্ত বিবাদে (সাহু, ২০১৪সি) ইতি টানার সিদ্ধান্ত বা ২০১৪ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে পুরোনো লেনদেনের ওপর কর (রেট্রোস্পেকটিভ ট্যাক্স) তুলে নেওয়ার ঘোষণা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

২০১৪ সালের বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা-মূলক সূচকে ১৬০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল ১৪২। এ থেকেই বোঝা যায় যে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়। এই অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার জন্যই ২০১৫-১৬ আর্থিক বছরের বজেটে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে (সাহু, ২০১৪এ; ২০১৪বি)। যেমন, বিভিন্ন স্তরে আগাম অনুমতি নেওয়ার ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন, একটি অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালুর প্রতিশ্রুতি, সম্পত্তি করের বিলোপ, আগামী চার বছরে কর্পোরেট কর বর্তমানের ৩০ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, ১৪টি নিয়ামক সংস্থার অনুমোদন একত্রে দেওয়ার জন্য একটি 'ই-বিজনেস' পোর্টালের ব্যবস্থা, লগ্নিকারি যাতে সহজে ব্যবসা তুলে দিতে পারেন সে জন্য 'দেউলিয়া আইন' আনার প্রস্তাব, বিবাদ নিরসনের জন্য সরকারি চুক্তি বিল আনার প্রস্তাব, আরও দু' বছরের জন্য কর ফাঁকি প্রতিরোধ বিধি মুলতুবি রাখা এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক বিবাদ নিরসনের জন্য আদালতগুলিকে নির্দিষ্ট শাখার ব্যবস্থা করা দেশে বাণিজ্যের পরিবেশ আরও সুগম ও মসৃণ করবে বলে আশা করা যায়। আগামী ২০১৬ সালে ১ এপ্রিল থেকে পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) চালু করার সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেটগুলিকে দেওয়া নানা রকম কর ছাড় ধাপে ধাপে তুলে নেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে দেশে আরও স্বচ্ছ ও যুক্তিসংগত কর কাঠামো গড়ে উঠবে। কারণ কর্পোরেটগুলির এই কর ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার ফলেই মূলত যাবতীয় কর সংক্রান্ত বিরোধের উদ্ভব হয়। এছাড়া প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এবং বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য মুছে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব

ইন্ডিয়ার সঙ্গে ফরোয়ার্ড মার্কেট কমিশনকে মিশিয়ে আসলে প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে স্তর বিন্যাস কমিয়ে বাণিজ্যের পরিবেশকেই আরও স্বচ্ছ ও মসৃণ করতে চাওয়া হয়েছে। লাল ফিতের ফাঁস কাটিয়ে, পদ্ধতিগত বিলম্ব দূর করে, বিভিন্ন চুক্তির রূপায়ণ তথা দ্রুত বিবাদ নিরসন নিশ্চিত করে লগ্নিকারিদের ভরসা ফেরানোই এই সমস্ত পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।

পণ্য ও পরিষেবা বিলটিকে আইনগত রূপ দেওয়ার জন্য অর্থমন্ত্রী নতুন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এই বিল বাণিজ্যিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হবে। দেশ জুড়ে অভিন্ন পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আইন চালুর জন্য সংসদের উভয়কক্ষের এবং অর্ধেকের বেশি রাজ্য বিধানসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করাতে হবে। জিএসটি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যগুলির সম্ভাব্য ক্ষতি ধাপে ধাপে পুষিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে, একগুঁয়ে বিরোধী দলগুলির দিকেও সমঝোতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সমস্ত চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে সরকার শেষ পর্যন্ত জিএসটি-র প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্য ও বিরোধী দলগুলিকে পাশে পেয়েছে। কিছু সংশোধন-সহ জিএসটি বিল গত ৬ মে, ২০১৫ তারিখে লোকসভায় পাস হয়েছে। জিএসটি বিলে পণ্য ও পরিষেবাসমূহের উৎপাদন, বিক্রয় ও উপভোগের ওপর একটি অভিন্ন ও সামগ্রিক কর বসানোর কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে বর্তমানে উৎপাদন শুল্ক, পরিষেবা কর, বিক্রয় কর, ভ্যাট, প্রবেশ কর, বিলাস ও বিনোদন কর, তথা পণ্য ও পরিষেবার ওপর সেস ও সারচার্জ ধরে যে অসংখ্য পরোক্ষ কর রয়েছে তার পরিবর্তে একটি অভিন্ন কর হিসাবেই জিএসটি চালুর প্রস্তাবনা। জিএসটি চালু হলে কর ফাঁকির ঘটনা যেমন কমবে তেমনই করের ভিত্তিও বাড়বে। একাধিক কর থাকার ফলে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় যে ত্রুটি রয়ে যায় এবং মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা যেভাবে বেড়ে যায় নতুন ব্যবস্থা চালু হলে নিশ্চিতভাবেই তার সুরাহা হবে বলে আশা করা যায়। জিএসটি চালু হলে সরকারের হিসেব মতো মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বিকাশ হার আরও ১ থেকে ২ শতাংশ বাড়বে। এখনও পর্যন্ত সংশোধনী প্রস্তাবে, রাজ্যগুলিকে পাঁচ বছর পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান, আন্তঃরাজ্য পণ্য পরিবহণে অতিরিক্ত ১ শতাংশ কর আরোপ, তথা অ্যালকোহলকে (মদ্য) জিএসটি-র আওতা থেকে বাইরে রাখার কথা রয়েছে। সেই সঙ্গে এখনকার মতো পেট্রোপণ্যের ওপর জিএসটি লাগু হচ্ছে না।

এর পাশাপাশি, এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পদ্ধতিগত ও প্রশাসনিক বিধিনিষেধ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় সেগুলি হয় দূর করা হয়েছে না হলে তার চেষ্টা জারি রয়েছে (সাহু ২০১৪বি)। এর মধ্যে বেশিরভাগই গুচ্ছ গুচ্ছ কাগজপত্রভিত্তিক কাজের জটিলতা যা থেকে তৈরি হয় লাল ফিতের ফাঁস। এই সমস্যার সুরাহা করতে শুধুমাত্র ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রযুক্তি-নির্ভর ই-গভর্নেন্স উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে চালু হয়েছে 'eBiz' পোর্টাল। এই পোর্টাল আসলে ওয়েবভিত্তিক একক জানালা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাণিজ্য সংস্থাগুলি ভারতে ব্যবসা করার জন্য নথিপত্র জোগাড় বা জমা দেওয়া সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব সেরে ফেলতে পারবে। এখনও পর্যন্ত এই G2B eBiz পোর্টালে চব্বিশ ঘণ্টার ভিত্তিতে অনলাইনে এগারোটি পরিষেবা মিলছে। এই মঞ্চে ৯টি দপ্তরের ২৬ ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারি পরিষেবাকে সুসমন্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার।

ভারতে পণ্য আমদানি বা ভারত থেকে পণ্য রপ্তানির জন্য আগে যে নথিপত্র দাখিল করতে হত তার সংখ্যা এখন দশ থেকে কমিয়ে তিন করা হয়েছে। ফলে লেনদেনের ব্যয় একলাফে অনেকটা কমেছে। এই নথিপত্রের জটিলতা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভিশাপের মতো ছিল। বিদেশি বিনিয়োগ প্রসার পর্ষদের (এফআইপিবি) ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ছাড়পত্র শিথিল করার ফলে এবার থেকে ৩০ দিনের মধ্যেই বিনিয়োগের প্রস্তাবে ছাড়পত্র মিলবে। আগে এই ছাড়পত্র পেতে অন্তত ৯০ দিন সময় লেগে যেত। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। যেমন, আগে মহারাষ্ট্রে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে যেখানে ৬৭ দিন সময় লাগত এখন সেই সময়সীমা কমিয়ে ২১ দিন করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে জড়িত প্রক্রিয়ার সংখ্যা ৭ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৩।

এছাড়া বৃহত্তর প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে রূপায়ণকারী কর্তৃপক্ষগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে [যেমন, ফরওয়ার্ড মার্কেট কমিশন (এফএমসি) এবং সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়ার (সেবি) প্রস্তাবিত সংযুক্তিকরণ বা একাধিক ও একই ধরনের আইনগুলিকে একত্রিত করা (যেমন, ৪৪টি শ্রম সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তে প্রস্তাবিত পাঁচমুখী শ্রমবিধি)] নিয়ামক ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর ও দক্ষ করতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। এর ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে নিয়মবিধি মেনে চলার প্রবণতা যেমন বাড়বে তেমনই, এ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশও নিঃসন্দেহে আরও সহজ হবে। বহু প্রতীক্ষিত শ্রম আইন সংস্কারের উদ্যোগ অবশেষে শুরু হয়েছে। এ দেশে ব্যাপক হারে উৎপাদন শুরু করার জন্য এই সংস্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে প্রচলিত প্রায় ২৫০ শ্রমবিধিকে যুক্তিসংগত করার এই উদ্যোগ শিল্পমহলের কাছে আশা জাগিয়েছে। সংস্কার প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে যে দুটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয় সেগুলি হল—'অভিন্ন শ্রম ও শিল্প সংক্রান্ত পোর্টাল' এবং 'শ্রম পরিদর্শন প্রকল্প'। শ্রম সংক্রান্ত পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট শর্ত এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ফলে শিল্পমহলে যারপরনাই উপকৃত হবে। বিশেষত, শ্রমবিধিগুলি খামখেয়ালিভাবে প্রয়োগ করে শ্রম পরিদর্শকরা অনেক সময়ই ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে বিপদে ফেলে থাকেন। এই শিল্পগুলি এবার অনেকটা স্বস্তি পাবে। লেবার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের (LIN) প্রচলন এবং একটি অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে পরিদর্শনের ব্যবস্থা শ্রমবিধিগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনেক স্বচ্ছতা আনবে। ন্যূনতম মজুরির ঊর্ধ্বসীমা মাসিক ৬৫০০ টাকা থেকে ১৫০০০ টাকা করা, সমাজের

দুর্বলতর অংশের জন্য ইপিএফ তথা অল্প হলেও পেনশনের ব্যবস্থা চালু করার যে উদ্যোগ প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এ দেশের শ্রমবাজারে দীর্ঘদিন ধরে যে অচলাবস্থার মধ্যে ছিল তা কাটাতে সম্প্রতি তিনটি আইনে কিছু পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই তিনটি আইনই মূলত এ দেশের শ্রমবাজার নিয়ন্ত্রণ করে। এই তিনটি আইন হল—কারখানা আইন (১৯৪৮), শ্রম আইন (১৯৮৮) [লেবার লজ অ্যাক্ট, ১৯৮৮] এবং শিক্ষানবিশি আইন (১৯৬১)। এই আইনগুলির কিছু বিধিনিষেধমূলক ধারার সংশোধনের প্রস্তাবে মন্ত্রীপরিষদ অনুমোদন দিয়েছে এবং বিষয়গুলি এবার সংসদে পেশ করা হবে। ম্যানেজার এবং নিয়োগকর্তাদের কিছুটা স্বাধীনতা দিয়ে বাড়তি সময়ের কাজ বা 'ওভার টাইম'-এর সীমা দ্বিগুণ করে কিছু ক্ষেত্রে ৫০ ঘণ্টা থেকে ১০০ ঘণ্টা এবং জনস্বার্থমূলক অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে ৭৫ ঘণ্টা থেকে ১২৫ ঘণ্টা করা হয়েছে। অনেকে এই ব্যবস্থাকে শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী বলছেন—কারণ কোনওরকম সুরক্ষা বা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা না করে বাড়তি সময়ের কাজের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। তবে আইন-ভঙ্গকারীদের জন্য শাস্তির মাত্রা কিছু বাড়ানো হয়েছে যাতে শ্রমিকদের ওপর শোষণ না চলে। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটা কথা বলা যায় যে এখানে কাজের সময়সীমা বাড়লে আখেরে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়বে। কারণ একটা কাজ শেষ করার জন্য এখানে একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এনে উৎপাদনশীলতার বিষয়টিকে কিছুটা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের সুরক্ষার সব রকমের ব্যবস্থা নিয়ে তাদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করাও সমান জরুরি। আরও ছাড় হিসাবে, কিছু বিশেষ শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের নিয়মে শিথিল করা হয়েছে (ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে যা জরুরি)। এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, আগে একজন শ্রমিক ২৪০ দিন কাজ না করলে সবেতন ছুটি-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতেন না। এখন থেকে ৯০ দিন কাজ করলেই তিনি এই সুবিধা পাবেন এই পদক্ষেপ অবশ্যই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করবে (সাহু, ২০১৪বি; ২০১৪ডি)।

১৯৮৮ সালের শ্রম আইনে সংশোধনের ফলে এবার থেকে সংস্থাগুলি শ্রম আইনের করা শর্তগুলি পূরণ না করেও আরও বেশি কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। কারণ প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুযায়ী ১০-৪০ জন কর্মীবিশিষ্ট সংস্থাগুলিকে এবার থেকে শ্রম আইনগুলির বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে নথিপত্র ও রিটার্ন জমা দেওয়ার আওতা থেকে ছাড় দেওয়া হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের ফলে অনাবশ্যক পদ্ধতিগত জটিলতা কমবে। কাজ অনেক দ্রুত হবে।

পরিকাঠামো, উৎপাদন ও বিনিয়োগ

ভারতের অর্থনীতির হাল ফেরাতে গেলে আগে উৎপাদন শিল্পকে চাঙ্গা করতে হবে। প্রতি মাসে ১০ লক্ষ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে এবং ২০১৩ সালে বেকারত্বের হার ছিল প্রায় ৩.৭ শতাংশ। কিন্তু একইসঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার জোগান কম। তাই আধা বেকারত্ব ও বেকারত্বের এই গভীর সমস্যার মোকাবিলায় উৎপাদন শিল্পই ভরসা যে কাজের জন্য স্বল্প দক্ষতা থাকলেও চলবে। তবে বেশ কয়েক বছর ধরে জিডিপি-তে উৎপাদন শিল্পের অবদান মোটামুটি ১৫ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। এনডিএ সরকার সঠিকভাবেই এই সমস্যাকে চিহ্নিত করেছে এবং মিশনরূপে উৎপাদন শিল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার আসলে বিশ্বের কাছে জানাতে চায় যে আগের তুলনায় ভারতের বিনিয়োগের পরিবেশ-পরিস্থিতি এখন অনেক অনুকূল এবং সরকার বিভিন্ন নিয়মাবলির ও পদ্ধতির সরলীকরণ ঘটিয়ে, বাস্তব পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করে ভারতকে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্য করে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক উৎপাদন সংস্থাগুলির কাছে ভারতকে উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে দেশে ভেতরে ও বাইরে এই 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পের সমান প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার ব্যাপারে খনি, টেলি-যোগাযোগ, বস্ত্র, গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ, জীবপ্রযুক্তি, রসায়ন, নির্মাণ, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, চর্ম, ওষুধপত্র ও রেলওয়ের মতো ক্ষেত্রের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় সরকার মোট ২১০০০ কোটি টাকা মূল্যের প্রকল্পের প্রস্তাব পেয়েছে এবং তার মধ্যে মোট ৬০০০ কোটি টাকা মূল্যবিশিষ্ট প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে।

এছাড়া, সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ আরও সহজ করে তোলা এবং বাস্তব পরিকাঠামো উন্নত করার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিস্তারিত পরিকল্পনা করেছে। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ওপর। বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার ব্যাপারে সরকার বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে।

মতাদর্শগত পরিবর্তনের অঙ্গ হিসাবে পিপিপি বা সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেলের ক্ষেত্রে সরকার আরও বেশি দায়িত্ব নিতে অগ্রণী হয়েছে। কারণ এর আগে এই ধরনের বেশ কিছু পিপিপি প্রকল্প মাঝপথে আটকে পড়েছে এবং অনুৎপাদক সম্পদের বোঝা বাড়িয়েছে। বিভিন্ন নীতি সঠিকভাবে মেনে প্রকল্প রূপায়ণের বহুবিধ ঝুঁকি সঠিকভাবে মোকাবিলার ব্যাপারে বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতার জন্যই এই পরিস্থিতির উদ্ভব। অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানা যাচ্ছে যে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত যত সংখ্যক প্রকল্প আটকে রয়েছে তার মূল্য ৮.৮ ট্রিলিয়ন টাকা যা জিডিপি-র ৭ শতাংশ।

অন্তর্বর্তী বাজেটে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকার বরাদ্দ ৮.৬ শতাংশ বাড়িয়ে ২০১৩-১৪ সালের ১,৬৬,৭৫৬ কোটি টাকা থেকে ১,৮১,১৩৪ কোটি টাকা করেছে। বিদ্যুৎ, কয়লা, সড়ক, অসামরিক বিমান পরিবহণ, বন্দর ও রেলের মতো ক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামো সংক্রান্ত প্রকল্পগুলি হাতে নেওয়া হবে। ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে

পরিকাঠামোর (যেমন, এনএইচএআই-এর মাধ্যমে সড়ক/মহাসড়ক নির্মাণ, বন্দর, স্মার্ট সিটি ও বিমানবন্দরের নির্মাণ ও উন্নয়ন) পাশাপাশি InvIT (ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট বা পরিকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল) বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এটা আসলে বিনিয়োগ টানার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা যেখানে কর ছাড়ের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এভাবেই এই তহবিল পরিকাঠামোর প্রকল্পগুলিতে অর্থ জোগানের বিষয়টি দেখভাল করবে। ২০১৪-১৫ সালের অন্তর্বর্তী বাজেটে জাতীয় মহাসড়কগুলির উন্নয়নে প্রায় ৩৮০০০ কোটি টাকা এবং 'প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক' যোজনার আওতায় সড়ক পথের উন্নয়নে আরও ১৪,৩৮৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের শহরগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা এবং ৮,৫০০ কিলোমিটার ব্যাপী উপযুক্ত মানের জাতীয় সড়ক নির্মাণই এখন সরকারের প্রধান লক্ষ্য। কারণ জাতীয় সড়কগুলিই এ দেশে পরিবহণের প্রধান মাধ্যম। এছাড়া, ১০০টি স্মার্ট সিটি নির্মাণের জন্য ৭০৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি মডেলে নতুন নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ, ১৬টি নতুন বিমানবন্দরের জন্য ১১,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ-সহ এলাহাবাদ ও হলদিয়ার মধ্যে সংযোগসাধনের জন্য গঙ্গার ওপর 'জল মার্গ বিকাশ' প্রকল্পে ৪,২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা রয়েছে বাজেটে। এর পাশাপাশি, পিপিপি মডেলে ১৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস পাইপ লাইন বসানো, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পখাতে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ, দিল্লি মেট্রোর আদলে অন্যান্য শহরেও পিপিপি মডেলে মেট্রোরেল চালু করা এবং নাবার্ড (ন্যাশনাল ব্যাংক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট)-এ আরও ৫,০০০ কোটি টাকা পুঁজি ঢালার ঘোষণা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বাজেটে ব্যাংকগুলিকে নগদ জমার অনুপাত ও স্ট্যাটিউটরি লিকিউডিটি রেশিও পূরণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়ে পরিকাঠামোক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানের জন্য দীর্ঘমেয়াদি বন্ড ছাড়ার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোক্ষেত্রে অর্থ সংস্থানে ব্যাংকগুলিকে উৎসাহিত করতে এ এক অভিনব পদক্ষেপ। পরে ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে সরকার পরিকাঠামোক্ষেত্রে বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে করেছে ৭০,০০০ কোটি টাকা। পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য অর্থের সংস্থান করতে সরকার জাতীয় বিনিয়োগ ও পরিকাঠামো তহবিল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে পরিকাঠামো বন্ড ছাড়ার কথাও ঘোষণা করেছে। বরাদ্দ ও নীতিগত পদক্ষেপ—সব মিলে বাজেটে পরিকাঠামোক্ষেত্র যেভাবে গুরুত্ব পেয়েছে তা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হল প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ গড়ে বিনিয়োগ টানা।

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির (এমএসএমই) দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রের মূল ভিত্তি। দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রের মোট উৎপাদনের ৪০ শতাংশই আসে ক্ষুদ্রশিল্পগুলি থেকে এবং রপ্তানিতেও এই ক্ষুদ্রশিল্পের অবদান ৪০ শতাংশ। উৎপাদন ক্ষেত্রে যত মানুষের কর্মসংস্থান হয় তার সিংহভাগই হয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পক্ষেত্রে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেছে যে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির মাত্র ১০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুযোগ পায়। এই ক্ষেত্র (এমএসএমসি) রিজার্ভ ব্যাংকের অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকলেও ব্যাংকগুলি এই ধরনের উদ্যোগকে ঋণদানে এগিয়ে আসে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি মাইক্রোফাইন্যান্স ইউনিট ডেভেলপমেন্ট রিফাইন্যান্স (মুদ্রা) ব্যাংক স্থাপনের ঘোষণা একদিকে যেমন অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগগুলির কাছে ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়ার পথ খুলে দেবে অন্যদিকে ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষেত্রকেও চাঙ্গা করে তুলবে। ২০,০০০ কোটি টাকার প্রাথমিক তহবিল এবং ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ সুনিশ্চিতকরণ তহবিল (ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পাস) নিয়ে 'মুদ্রা' ব্যাংকের কাজকর্ম শুরু হবে। ঋণদানের ক্ষেত্রে তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এছাড়া, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে (এসইজেড) পুনরুজ্জীবিত করা, প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি আহ্বান, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে সফল করার জন্য প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংস্কার প্রক্রিয়া জারি রাখতে বর্তমান সরকার একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে। যে সমস্ত উৎপাদন সংস্থা কোনও কারখানা বা যন্ত্রপাতিতে ২৫ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করবে, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার বিশেষ পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে সেগুলিকে ৩ বছরের জন্য বিনিয়োগে ১৫ শতাংশ ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বাজেটে। সেই সঙ্গে, একশোটি জেলায় মহিলাদের জন্য বিশেষ ধরনের 'এসইজেড' গঠনের ঘোষণা রয়েছে।

'দক্ষ ভারত' গঠন এবং তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তোলার ওপর যে সরকার বিশেষ মনোযোগ দিচ্ছে তা দেশ জুড়ে পাঁচটি নতুন আইআইটি ও পাঁচটি নতুন আইআইএম-সহ উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। সরকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শিল্পনগরী গঠন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি তথা উৎপাদন শিল্পের বিকাশের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই সঙ্গে, নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার 'প্রারম্ভিক তহবিল', গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের কথা মাথায় রেখে গ্রামীণ শিল্পোদ্যোগের জন্য ১০০ কোটি টাকার 'প্রারম্ভিক তহবিল' তপশিলি জাতিভুক্ত শিল্পোদ্যোগীদের জন্য ২০০ কোটি টাকার তহবিল এবং ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে 'তরুণ নেতৃত্বের কর্মসূচি'-র (ইয়ং লিডার প্রোগ্রাম) ঘোষণা নিঃসন্দেহে সর্বস্তরে উৎসাহ জোগাবে।

বিমা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির (এফডিআই) ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করা, পুরোনো লেনদেনের ওপর কর (রেট্রোস্পেকটিভ ট্যাক্স) প্রায় তুলে দেওয়া, ই-কমার্স, বিমা, প্রতিরক্ষা বা স্বাস্থ্য বিমার ওপর প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি আদতে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নি আকর্ষণের জন্য সরকার সংস্কার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে যে কতটা আন্তরিক তারই পরিচয় দেয়। কারণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উৎপাদন শিল্প-নির্ভর বিকাশ ত্বরান্বিত করতে এই প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রক প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে অন্যান্য সরকারি সংস্থার মতামত চেয়ে একটি ক্যাবিনেট নোট বিতরণ করেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির সীমা বিভিন্ন ধাপে যথাক্রমে ৪৯ শতাংশ, ৭৪ শতাংশ এবং ১০০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের কোনও প্রশ্ন জড়িত নেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি লগ্নির সীমা হবে ৪৯ শতাংশ পর্যন্ত। অন্যদিকে যে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রস্তাব রয়েছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই সীমা হবে ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আনার প্রশ্ন জড়িত সেখানে কোনও ঊর্ধ্বসীমা রাখা হয়নি। এর ফলে ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ শিল্প যৌথ উদ্যোগ গঠনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমস্ত রকম সুবিধা নিতে পারবে এবং এই ধরনের উদ্যোগের হাত ধরে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্র

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার যখন সহযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতামুখী যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে ঠিক তখনই চতুর্দশ অর্থ কমিশন তার সুপারিশগুলি পেশ করে। নতুন সরকার এই কমিশনের সুপারিশগুলি গ্রহণ করে দেশে সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করে যে 'বিভাজ্য তহবিল' বা 'ডিভিসিবেল পুল' থেকে কর রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয় সেই তহবিল থেকে বণ্টনের অনুপাতও এবার চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ মেনে পরিবর্তন করা হয়েছে। এবার থেকে রাজ্যগুলি ৩২ শতাংশের পরিবর্তে নিঃশর্তভাবে ৪২ শতাংশ কর রাজস্ব পাবে এই তহবিল থেকে। সেই সঙ্গে স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে অনুদান, রাজস্ব ঘাটতিযুক্ত ১১টি রাজ্যকে বিশেষ অনুদান, তথা কয়লা নিলামে রাজ্যের অংশ থাকার অর্থ হল কেন্দ্রের কাছ থেকে এবার বিপুল আর্থিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব পাচ্ছে রাজ্যগুলি। এই সমস্ত পদক্ষেপের ফলে কিন্তু কেন্দ্রের আর্থিক ক্ষমতা কমবে। ফলে রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের প্রবণতা কমবে। রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত 'আনটায়েড ফান্ড' অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যয়ের বাধ্যবাধকতাহীন আর্থিক সহায়তায় বিপুল বৃদ্ধির ফলে রাজ্যগুলি এবার থেকে নিজেদের সুবিধা ও প্রয়োজন মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির রূপরেখা তৈরি করতে পারবে। তবে রাজ্যগুলি কীভাবে এই অর্থ ব্যবহার করবে তা নিয়ে অবশ্য একটা সংশয় রয়ে যায়। কারণ, প্রশাসনে মান ও দক্ষতা সব রাজ্যে সমান হয় না। ফলে একদিকে নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক ও ব্যয়সংবলিত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সংখ্যা হ্রাস ও বিপুল পরিমাণে 'মুক্ত' অনুদানের (আনটায়েড ট্রান্সফার) ফলস্বরূপ অর্থের অপব্যবহারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বরাদ্দের কাঠামোতে পরিবর্তন এনে ২০১৪-১৫ সালে রাজ্যগুলিকে এক বৃহত্তর আর্থিক স্বশাসন দেওয়া হয়েছে। ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে মোট ৪,৭৫,৫৩২ কোটি টাকা যোজনা বরাদ্দের মধ্যে রাজ্যগুলি পেয়েছিল ১,১৯,০৩৯ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ সালের বাজেটে ৫,৭৫,০০০ কোটি টাকা যোজনা বরাদ্দের মধ্যে রাজ্যগুলি পেয়েছে ৩,৩৮,৪০৮ কোটি টাকা। এই অতিরিক্ত বরাদ্দ, যা জিডিপি-র প্রায় ১.৬ শতাংশ, রাজ্যগুলিকে হস্তান্তর করেছে কেন্দ্র। এছাড়া শ্রম ও জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইন রূপায়ণের দায়িত্ব কেন্দ্র যেভাবে রাজ্য সরকারগুলির ওপর তুলে দিয়েছে তা আসলে সহযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতামুখী যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরে। সুশাসিত যে সমস্ত রাজ্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে সেই রাজ্যগুলি এই তহবিলের সদ্ব্যবহার ঘটিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে।

সামগ্রিকভাবে, নতুন সরকারের প্রথম বছরের আর্থিক নীতিতে সংস্কার প্রক্রিয়া, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে উৎপাদন শিল্প বিকাশের জন্য বিনিয়োগ টানতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিবেশ সহজ করা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পদক্ষেপের ফল কী হবে তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল।❑

[প্রভাকর সাহু দিল্লির 'ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক গ্রোথ'-এ সহযোগী অধ্যাপক।
email : pravakarfirst@gmail.com
অভিরূপ ভুঁইয়া নীতি বিশ্লেষক (কোয়ান অ্যাডভাইসরি, দিল্লী)।]

References :

Banerjee, A.V., Duflo. E., Rachel, G. and Cynthia, K. (2010). 'The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation.' Cambridge, Massachusetts.

Sahoo, P. (2014a) "*India's 2014 Budget : Enduring Challenges and New Responses"* National Beaureu of Asian Research, Washington D.C., July.

Sahoo, P. (2015a). "*India's 2015-16 budget : Targeted reforms to promote investment*", National Bureau of Asian Research, Washington D.C. April.

Sahoo, P. (2015b). "True to the Spirit of Federalism (Special Article)". *Yojana*. Vol.-59, March, 2015. pp 13-17.

Sahoo, P. (2014b). "*Making India an attractive Investment Destination : Analyzing FDI Policy and Changes*". National Bureau of Asian Research, Washington, D.C., December 2014.

Sahoo, P. (2014c). "Is the regime over?" *Deccan Herald.* Oped, December 2nd, 2014.

Sahoo, P. (2014d). "Finally, a Push for Labour Reforms", *The Hindu-Business Line,* 23rd Oct. 2014.

Sahoo, P. (2014e). 'Roadmap to Financial Inclusion : Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana' *Yojana.* Vol. 58, October 2014, Pp. 30-36.

শক্তিক্ষেত্রে নতুন উচ্চতায় উত্থান

ভারত বিশ্বের দ্রুতগতিতে বিকাশশীল অর্থনীতিগুলোর মধ্যে অন্যতম। অর্থনৈতিক বিকাশের প্রধান অনুঘটক শক্তিক্ষেত্র। শিল্পায়ন ও নগরায়ণ-সহ সার্বিক উন্নয়নের চাবিকাঠিও এই ক্ষেত্র। ভারতীয় শক্তিক্ষেত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়ে পর্যালোচনা করছেন **কে আর সুধামন।**

ভারত বিদ্যুৎক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার সময়কার মাত্র ১৩৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে ভারতে এখন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ২,৬১,০০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়েছে। যদিও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬০ শতাংশই আসে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, মূলত কয়লা আর সামান্য পরিমাণে গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে, কিন্তু পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি কাজে লাগানোর ওপর উত্তরোত্তর গুরুত্ব বাড়ানো হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট ১,৪৮,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার ৭০ শতাংশই এখনও অব্যবহৃত। বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেখানে অন্তত ৫০০০০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ এখনও উৎপাদনের অপেক্ষায়। পারমাণবিক শক্তিরও প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এরও রয়েছে পরিবেশগত কিছু উদ্বেগের দিক। অবশ্য এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর ভারতে এখন প্রায় ৬০০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন হয়। ২০৩২ সাল নাগাদ এই শক্তির উৎপাদন বেড়ে ৬৩০০০ মেগাওয়াট পৌঁছনোর কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ২০০৯ সালে অসামরিক পরমাণু চুক্তি হওয়ায় ১০০০ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন ক্ষমতার বৃহদাকার পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশে গড়ে তোলার পথ সুগম হয়েছে। ইদানীং অবশ্য বায়ু ও সৌরবিদ্যুৎ যুগান্তকারী নানা উদ্ভাবন ঘটিয়ে এগিয়ে এসেছে আর এটা বিশেষ করে সৌরবিদ্যুতেই দেখা যাচ্ছে বেশি। বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন দেশে ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছে। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থানের মতো রাজ্যে ২৫০০০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদন হচ্ছে। আগামী দিনে বিদ্যুৎক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চলেছে সৌরবিদ্যুৎ। বায়ুবিদ্যুতের উৎপাদন সম্ভাবনা যেখানে সারা দেশে ১.৫ লক্ষ মেগাওয়াট, সেখানে সৌরবিদ্যুৎ একাই ৩ লক্ষ মেগাওয়াটের বেশি উৎপাদন করতে পারে। এ পর্যন্ত দেশে মাত্র ৩৮০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ-ই কেবল উৎপাদন করা গেছে। সৌরবিদ্যুতের উপকরণ সংক্রান্ত খরচ কমে আসতে থাকায় আগামী দিনে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। মোদী সরকার সম্প্রতি ২০২২ সালের মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রাটা ইউপিএ সরকারের ২০০০০ মেগাওয়াট থেকে ৫ গুণ বাড়িয়ে ১ লক্ষ মেগাওয়াট করে দিয়েছে। এরই মধ্যে তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, দিল্লি, পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান আর অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যে তো সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে নিঃশব্দ বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে ছাদে বসানো সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে নেট মিটার-এর ব্যবস্থা যুক্ত হওয়ায়। কেননা এর ফলে সঞ্চয়ের জন্য ব্যাটারির আর প্রয়োজন থাকছে না বলে খরচ অন্তত ২৫ শতাংশ কমছে।

১৯৯০-এর দশক থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যাপক বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারত এখনও বিদ্যুৎ ঘাটতির দেশ। তাই অনেক কিছু করা বাকি বলেই এনডিএ সরকার গত এক বছরে সঠিকভাবেই দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে নানা ব্যবস্থা নিয়েছে। সারা বিশ্বে এখনও ১৪০ কোটি মানুষ বিদ্যুতের স্পর্শবঞ্চিত। ভারতে এদের মধ্যে ৩০ কোটিরও বেশি লোকের বাস।

আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার হিসেব অনুযায়ী ভারতকে ২০৫০ সালের আগেই ৬০০ থেকে ১২০০ গিগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ানের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৫ সালে ছিল ৭৪০ গিগাওয়াট। সেই নিরিখে ভারতকে আরও বেশি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। ভারত যে প্রযুক্তি আর জ্বালানি ব্যবহার করুক না কেন, তার বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এই পদক্ষেপে বিশ্বের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে প্রভাব পড়বেই। তাই সরকার পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি সম্পদের অ-ব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

প্রায় ৮০ কোটি ভারতবাসীই কিন্তু এখনও সনাতনি জ্বালানি যেমন কাঠ-কুটো, খড় ইত্যাদি কৃষিজ বর্জ্য ও ঘুঁটে ব্যবহার করে রান্না আর অন্যান্য দরকারে উত্তাপের প্রয়োজনে। সনাতনি জ্বালানি কিন্তু শক্তির অ-দক্ষ উৎস কেননা এর দহনে প্রচুর ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দাবি অনুযায়ী এ দেশে প্রত্যেক বছর ৩ থেকে ৪ লক্ষ লোক ঘরের মধ্যে বায়ুদূষণ আর কার্বন মনোক্সাইড দূষণের ফলে প্রাণ হারান। এটা হয় মূলত সনাতনি জ্বালানি আর উনুন জ্বালানোর ফলেই। এ দেশে বিদ্যুৎক্ষেত্রের বিকাশ সনাতনি জ্বালানি ব্যবহারের উপযুক্ত বিকল্প খুঁজে নিতে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সরকার সঠিক-ভাবেই এক উচ্চাশামুখী পুনর্ব্যবহারযোগ্য

শক্তি বিকাশ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বায়ুদূষণ সমস্যা ছাড়াও ভারতের জলদূষণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিবেশগত সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যুতের স্থিতিশীল উৎপাদন ও সরবরাহ যে খুবই প্রয়োজন, সমীক্ষায় তা বেরিয়ে এসেছে। এছাড়া দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতি, বাড়তে থাকা রপ্তানি, উন্নত পরিকাঠামো এবং ক্রমশ বেড়ে চলা পারিবারিক আয় দেশে শক্তির চাহিদাটা যে দিন দিন আরও বাড়িয়ে তুলবে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

মোদী সরকার সঠিকভাবেই শক্তিক্ষেত্রে বিরাট গুরুত্ব দিয়েছে যাতে ভারতে সবার জন্যই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ মেলে আগামী ৪-৫ বছরে। এজন্য অবশ্য বিদ্যুৎ চুরির মতো সমস্যার মোকাবিলার সঙ্গে সঙ্গে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সঙ্গে কয়লা সরবরাহের সুষম যোগাযোগ, বিদ্যুৎ বণ্টন ক্ষেত্রের ত্রুটি দূর করা, পুনর্ব্যবহারযোগ্য সৌর, বায়ু ও জল সম্পদের সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিপুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উল্লেখযোগ্য। গৃহীত প্রধান প্রধান পদক্ষেপগুলির ফলে এরই মধ্যে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫.৮ শতাংশ বেড়েছে। এই তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন এখন দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সরকার বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ ও নগর এলাকায় সুলভে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ জোগান সুনিশ্চিত করতে ১.১ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তাও দিচ্ছে। সুবিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে কয়লার বার্ষিক উৎপাদন বাড়িয়ে ১০০ কোটি টনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি কয়লা-খনির নিলামের দ্বারা এই প্রক্রিয়ার সূচনা হয়েছে। এর ফলে রাজকোষে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা জমা পড়েছে। এর একটা বড় অংশই অবশ্য খনিগুলি যে সব রাজ্যে, সেই সব রাজ্যের কোষাগারে যাবে (ওই সব পশ্চাৎপদ রাজ্যগুলির উন্নয়নের লক্ষ্যে)।

সরকার ২০২২ সালের মধ্যে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির উৎপাদনের লক্ষ্যটা অনেক বাড়িয়ে ১ লক্ষ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ আর ৬০ হাজার মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলায় আগামী সাত বছরে পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে বিনিয়োগ বেড়ে ১০ লক্ষ কোটি টাকায় দাঁড়াবে বলে মনে করা হচ্ছে। বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলোর কাজ দ্রুত ফের শুরুর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়াও সরকার পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির জন্য বাজেট বরাদ্দ ৬৫.৮ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের জন্য নতুন পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি নীতি ঘোষণার প্রয়াসও নিয়েছে।

শক্তি সুরক্ষার জন্য পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (NDA) সরকার প্রতিটি ৫০০ কোটি ডলার মূল্যের মোট পাঁচটি তহবিল গড়তে চায় পরিবেশ অনুকূল শক্তি উৎসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে।

নতুন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি মন্ত্রক রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি নানা সংস্থা, যেমন, পাওয়ার ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, রুর‍্যাল ইলেকট্রিফিকেশন কর্পোরেশন, ইন্ডিয়ান রিনিউয়েবল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, আইএফসিআই লিঃ, এসবিআই ক্যাপিটাল মার্কেটস লিঃ, ও আইসিআইসিআই ব্যাংক লিঃ প্রভৃতির সহায়তা চায় ২৫০০ কোটি ডলার মূল্যের তহবিল গড়তে। সরকারের পরিবেশ অনুকূল শক্তির প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার নেপথ্যে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভূমিকা রয়েছে। ওই চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দূষণকারক পদার্থ নির্গমনের মাত্রা ২০০৫ সালে যা ছিল, ২০২৫ নাগাদ তার পরিমাণ ২৬-২৮ শতাংশ কমানোর অঙ্গীকার করেছে। অন্যদিকে চীন অঙ্গীকার করেছে যে ক্ষতিকারক কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ক্ষেত্রে তারা ২০৩০ নাগাদ শীর্ষে পৌঁছবে।

সরকারের ঘোষণা করা নতুন সব ব্যবস্থায় দেশের মধ্যে নির্মাতাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে এনটিপিসি, কোল ইন্ডিয়া, এনার্জি এফিসিয়েন্সি সার্ভিসেস, পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার দেওয়া ১ লক্ষ কোটি টাকার বরাত অন্তর্দেশীয় উৎপাদনশিল্পকে শক্তিশালী করে তুলবে। সেইসঙ্গে গতিশীল হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযানও। এছাড়া সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎক্ষেত্রে দেশেই নির্মাতাদের বড় বড় অঙ্কের বরাত দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সক্ষমতা বাড়িয়ে দামের দিক থেকে এবং বিশ্বমানের প্রযুক্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগী হয়ে উঠতে পারে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি ১০০০ মেগাওয়াট করে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প কিনবে (বিশেষ সংস্থান-সহ যাতে কেবল দেশে তৈরি সৌর সেল ও মডিউল ব্যবহার করা যায়)। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের নানা কেন্দ্র ৩০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প কিনবে। সরকার এছাড়াও সংরক্ষণের মাধ্যমে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ বাঁচানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে সব মিলিয়ে ১০,০০০ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ বাঁচবে, যা, ১১ কোটি মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলার পাশাপাশি ৪০,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় করবে।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে সরকারের নজর কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ হল দেশের শক্তি আমদানির খরচ এরই মধ্যে ১৫,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাওয়া। এই অঙ্কটা ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০,০০০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারত অশোধিত তেলের চাহিদার ৮০ শতাংশ আর প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার ১৮ শতাংশই আমদানি করে। ২০১৪-র এপ্রিলের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে মোট তাপবিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৬৮.৪ গিগাওয়াট। জলবিদ্যুৎ ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪০.৫ গিগাওয়াট ও ৩১.৭ গিগাওয়াট। বায়ুবিদ্যুতের বাজার দেশে আগামী বছরে ২০,০০০ কোটি টাকা (৩১৬ কোটি ডলার) বিনিয়োগ টানবে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রের নানা সংস্থা আরও ৩০০০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদন নিজেদের ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী। আন্তর্জাতিক আর দেশীয় মিলিয়ে প্রায় ২৯৪টি সংস্থা এদেশে আগামী ৫ থেকে ১০ বছরে সৌর, বায়ু, ক্ষুদ্র জলবিদ্যুৎ ও বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুতের ২৬৬ গিগাওয়াট উৎপাদন করবে বলে অঙ্গীকার

করেছে। এই প্রয়াসের ফলে অন্তত ৩১,০০০ থেকে ৩৫,০০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ হবে। মনে রাখতে হবে যে ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৫-র ফেব্রুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে ৯৫৪৮.৮২ লক্ষ ডলার।

আগামী ৪-৫ বছরে ভারতীয় বিদ্যুৎক্ষেত্রের বিনিয়োগ সম্ভাবনা ২৩৭৩৫ কোটি ডলার যা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সরবরাহ, বণ্টন ও সরঞ্জাম ইত্যাদিতে প্রচুর সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় কয়লা, বিদ্যুৎ, নতুন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি দফতরের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

সরকারের আশু লক্ষ্য হল ২০১৯ সালের মধ্যে দেশে দুই ট্রিলিয়ন ইউনিট শক্তি উৎপাদন সুনিশ্চিত করা। এর অর্থ বর্তমানের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়ে দ্বিগুণে নিয়ে যাওয়া যাতে আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক ও কৃষিকাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের জোগান সুনিশ্চিত করা চলে।

সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে মেগাওয়াটপিছু প্রায় ২.৪ হেক্টার (৬ একর) জমি লাগে। সেটা কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতোই যদি প্রয়োজনীয় কয়লার খনন এলাকা, ব্যবহার্য জলের মজুত এলাকা এবং ছাই মজুতের জায়গাকে হিসেবে ধরা হয় আর একইভাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেরও যদি জলাধারের জন্য নিমজ্জিত এলাকাকে হিসেবে ধরা হয় তার সমান। দেশের ১ শতাংশ জমি (৩২০০০ বর্গকিলোমিটার)-তে ১৩.৩ লক্ষ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের উপযোগী জমি ভারতের সব প্রান্তে পড়ে আছে যা অনুর্বর। পতিত আর উদ্ভিদবর্জিত আর এর পরিমাণ ভারতের মোট ভূভাগের ৮ শতাংশের বেশি। পতিত জমির (৩২০০০ বর্গকিলোমিটার) অংশ বিশেষে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়া হলে ২০০০০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে (যা ২০১৩-১৪-তে দেশে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের দ্বিগুণ) এবং জমির উৎপাদনশীলতা দাঁড়াতে পারে একর প্রতি ১৫ লক্ষ টাকা (৬ টাকা/প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা হিসেবে)। এটা অনেক শিল্প সংস্থার উৎপাদনশীলতার সমতুল আর সেচসেবিত সব থেকে উৎকৃষ্ট কৃষিজমির উৎপাদনের বহুগুণ বেশি। তাছাড়া এই সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো কোনও কাঁচামাল নির্ভর নয় আর স্বত-উৎপাদনক্ষম। প্রকৃতপক্ষে সৌরবিদ্যুতের অসীম সম্ভাবনা রয়েছে। যদি ভবিষ্যতে সামান্য উৎপাদনশীল জমিগুলোকেও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয় তবে তা জীবাশ্ম জ্বালানি চাহিদার পুরোটাই প্রতিস্থাপিত করতে পারে। ভারতের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনাটা এমনই যে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র/জাপানের মাথাপিছু শক্তি খরচের চাহিদা মেটাতে পারে (সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে)।

ভারতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণটাই একটা চ্যালেঞ্জ। কিছু কিছু রাজ্য সরকার উদ্ভাবনীমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জমি পাওয়ার উপায় খুঁজছে। যেমন সেচখালের ওপরে সৌর প্যানেল বসানোর ব্যবস্থা যার দ্বারা সেচের জলের বাষ্পীভবন সংক্রান্ত ক্ষয় কমানোর পাশাপাশি প্রচুর সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যায়। গুজরাটই হল প্রথম রাজ্য যারা খাল সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করে রাজ্যে ১৯০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ নর্মদা খালের ওপর সৌর প্যানেল লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে। ভারতে এমন প্রকল্প ছিল এই প্রথম। এর পরিবেশগত দিকও রয়েছে। সৌরবিদ্যুতের ব্যাপক ব্যবহার কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর নির্গমন ২০৫০ সাল নাগাদ বছরে ৬০০ কোটি টনেরও বেশি কমাতে পারে। এই পরিমাণটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনকার শক্তি সম্পর্কিত সব কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের চেয়ে বেশি যা সারা পৃথিবীতে পরিবহণ ক্ষেত্রে সরাসরি সব নির্গমনের সমান। ভারতের বহু অংশে সূর্যালোক অত্যন্ত প্রখর আর আকাশও থাকে পরিষ্কার। এইভাবে চলতে পারলে ভারত ২০৫০ সাল নাগাদ বাড়তি কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন মাত্রায় সর্বোচ্চ হ্রাসে সক্ষম হবে। আর সেইসঙ্গে চীনের সঙ্গে মিলে পৃথিবীর বাড়তি নির্গমনের অর্ধেকই কমাতে সক্ষম হবে। ভারত সৌরবিদ্যুৎ হাব হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেতে পারে এবং সরকার সঠিক নীতি-কাঠামোই রচনা করছে। যদিও এখন সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন মাত্র ৪০০০ মেগাওয়াটের চেয়েও সামান্য কম। আগামী ৫-৭ বছরে ছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ৪০০০০ মেগাওয়াটে পৌঁছে যাবে। জার্মান উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে পরিবেশ-অনুকূল সরবরাহ পরিসর গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই ১০০ কোটি ইউরো 'সফ্‌ট লোন' দিয়েছে। ছাদের ওপর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা গড়তে এই ব্যাংক খুব শিগগিরই আরও ১০০ কোটি ইউরো ঋণ দেবে। নেট-মিটারিং ব্যবস্থা চালু হওয়ায় দেশের অনেকগুলো শহর-নগরে এখন এই ছাদের উপর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। দিল্লির তো একাই ২০০০ মেগাওয়াট ছাদের উপর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে যা, ওই মহানগরের মোট বিদ্যুৎ খরচ ৬০০০ মেগাওয়াটের এক-তৃতীয়াংশ। একইভাবে সব প্রধান নগরেরই এই রকম প্রচুর সম্ভাবনা বিদ্যমান আর এটা, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বাড়ির মালিক দুজনেরই কাছে সুবর্ণ সুযোগ কেননা ওদের বিদ্যুৎ-বিল একদিকে দুই-তৃতীয়াংশ কমবে আর সৌর প্যানেল পুরোপুরি মেন্টেন্যান্স ফ্রি হওয়ায় এবং অন্তত ২৫ বছর স্থায়িত্ব হওয়ায় এ বাবদ বিনিয়োগ ৪-৫ বছরের মধ্যেই পুষিয়ে যাবে।

ভারতীয় পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা (ইরেডা) ২০০০ কোটি টাকার বন্ড ছাড়তে চলেছে বাজারে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই। সরকারের সৌরবিদ্যুৎ সংক্রান্ত উদ্যোগকে সহায়তা জোগানোর জন্যই এই প্রয়াস, যাতে উদ্ভাবকদের এই বাবদে 'সফ্‌ট লোন' জোগানো যায় ও ছাদের উপর সৌরবিদ্যুৎ মিশন সাফল্য লাভ করে।

নতুন ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব তরুণ কাপুর সম্প্রতি পিএইচডি চেম্বার অব কমার্সের এক শীর্ষ বৈঠকে জানিয়েছেন, 'সরকার তার সৌরবিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রয়াসে সহায়তার জন্য কর-মুক্ত বন্ড ছেড়ে টাকা তোলার জন্য ৫০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে আর এর মধ্যে ইরেডা-কে ২০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরে যদি ২০০০ থেকে ৩০০০

মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়িত হয়, তাহলেই সরকার সন্তুষ্ট হবে।' একথা জানিয়ে শ্রীকাপুর আরও বলেন যে, ২০১৭-১৮-র আর্থিক বছর থেকে কেন্দ্রে ক্ষমতাশীল সরকারের লক্ষ্যই হবে প্রতি বছর অন্তত ১০০০০ মেগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো। কয়েক বছর এই হারে চালানোর পর এই মাত্রাটা বাড়িয়ে ১৫০০০ মেগাওয়াটে নিয়ে যেতে হবে।

যুগ্ম সচিব আরও জানিয়েছেন যে সরকার শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুতের ক্ষেত্রে ভরতুকি তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ-প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জনে। তবে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য কেন্দ্রের এবং সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য ভরতুকি চালু থাকবে। সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় এরই মধ্যে ইউনিটপিছু ৬-৭ টাকায় নেমে আসায় এবং সেটা আরও কমে ৪.৫ টাকায় পৌঁছনোর সম্ভাবনা থাকায় এক্ষেত্রে ভরতুকির প্রয়োজনটা দ্রুত কমছে আর অন্যদিকে তাপবিদ্যুতের খরচ বাড়ছে।

সরকার ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২৫টা সৌরপার্ক গড়ার লক্ষ্যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে। এ বাবদ ৪০৫০ কোটি টাকাও বরাদ্দ করা হয়েছে। এই পার্কগুলো বিনিয়োগকারী ও উদ্ভাবকদের জন্য নানা সুবিধা দেবে। ছোট ছোট আবাসন প্রকল্প নির্মাতাদের সমস্যার বেশিরভাগই দূর করে দেবে এই পার্ক।

কর্মমুখী দক্ষতা হল এমন একটা ক্ষেত্র যেটায় সৌরপার্ক গড়ে তোলায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তাপবিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ আর বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল আছে। তবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বহুগুণ বাড়াতে প্রচুর জনবল প্রয়োজন বিশেষত দূর-দূরান্তে ছোটখাট প্রকল্পের জন্য এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ছাদের ওপর সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য। কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশে সরকারের ইতিমধ্যেই একটি পরিকল্পনা রয়েছে —সেটা বাড়ানো দরকার দেশের নানা জায়গায় তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে। দফতরের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন খরচ চলতি বছরের মধ্যেই ২৫-৩০ শতাংশ কমিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন বর্তমানের ৬-৭ টাকা থেকে কমে এটা ৪.৫০ টাকা হতে চলেছে। 'উদ্ভাবনী সমাধান সূত্র আনায় এবং সৌর ও বায়ুবিদ্যুতের খরচ কমানোর দিকে সরকার নজর দিয়েছে।' দেশে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকার বিশিষ্ট উপদেষ্টা সংস্থা প্রাইসওয়াটারহাউস কুপারকে দায়িত্ব দিয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারের পরিকল্পনা দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে শক্তি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করবে। আগামী এক-দু দশকে ভারত ৮-৯ শতাংশ হারে বিকাশ লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে আর সেক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা হবে প্রচুর। বিদ্যুতের ঘাটতি থাকা দেশের মাথাপিছু কম বিদ্যুৎ খরচ থেকে ওই দিকে রূপান্তরের জন্য সরকার সঠিক নীতি নিয়েছে। যাতে বিদ্যুৎক্ষেত্র ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল রাখতে পারে। আর এই প্রথম সরকার, তাপ, গ্যাস, জলবিদ্যুৎ, পরমাণু বিদ্যুৎ, বায়ু, সৌরবিদ্যুৎ আর বায়োগ্যাস থেকে পাওয়া বিদ্যুতের উৎপাদনের মধ্যে একটা সুষম হার বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেছে। চীন আমাদের চারগুণ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে আর ওদেশের সঙ্গে পাল্লা দিতে ভারতকে এখনও অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে। সৌর আর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বাড়ানোরও পরিকল্পনা ভারতের রয়েছে। সৌরবিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জন্য হালকা আর সস্তা লিথিয়াম ব্যাটারি এসে যাওয়ায় সৌরবিদ্যুৎ এখন ব্যাক-আপ পাওয়ারের জন্য ব্যবহৃত ডিজেল জেনারেটরের বিকল্প হয়ে উঠতে চলেছে। দেশে ৩০ হাজার মেগাওয়াটেরও বেশি ডিজেল উৎপাদিত বিদ্যুৎ খরচ হয় আর তার দরুন তেল আমদানিতে ব্যয় হয় প্রচুর বিদেশি মুদ্রা। এর ফলে সেই খরচ অনেকটাই বাঁচানো যাবে।❑

[লেখক সিনিয়র বিজনেস জার্নালিস্ট।
email : sudhaman23@gmail.com]

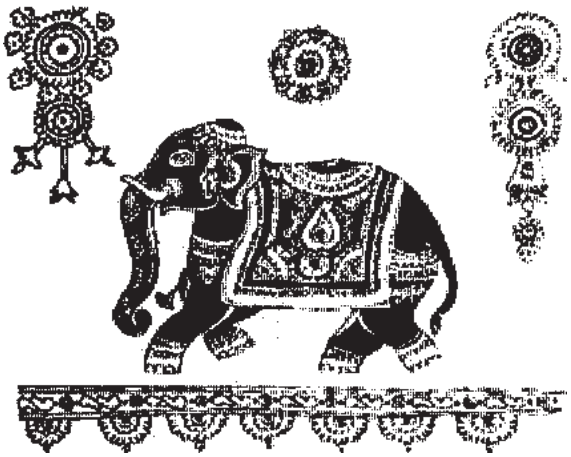

এ | গি | য়ে | চ | লে | ছে | ভা | র | ত

অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশে কর্মসংস্থানের বিকাশ

শিল্পের উন্নয়ন, বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য দেশের অনমনীয় শ্রম আইনের সংস্কার প্রয়োজন, শিল্পমহলের এই দাবি দীর্ঘদিনের। আবার সংস্কারের পথে শ্রমিক কল্যাণের সঙ্গে আপস যাতে না হয়, তাও সুনিশ্চিত করা দরকার। দ্বিমুখী এই উদ্দেশ্যের মধ্যে ভারসাম্য রেখে গত এক বছরে নতুন সরকারের নানা গঠনমূলক প্রয়াসের বিবরণ জানিয়েছেন **দীপক রাজদান।**

গত কয়েক দশকে শ্রমশক্তি আকারে ও পরিমাণে অনেকটা বাড়লেও শ্রম আইনের অনমনীয়তার কারণে দেশে কর্মসংস্থানের বিকাশ সেভাবে হয়নি। শুধু শিল্প বিকাশের জন্যই নয়, কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টির জন্যও যে শ্রমক্ষেত্রের সংস্কার প্রয়োজন, সেকথা অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বারবার বলে আসছেন। তবে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য না হওয়ায় এ বিষয়ে খুব একটা এগোনো যায়নি। কিন্তু এই অচলাবস্থা অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না এবং বিকাশশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানকে অপ্রতিহত রাখতে এর অবসান হওয়া দরকার, সৌভাগ্যবশত এখন তা সকলেই অনুভব করছেন। বর্তমান সরকার তার কার্যকালের প্রথম বছরেই যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট, 'ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি' এবং 'শ্রমেব জয়তে'-র মধ্যে কোনও বিরোধ নেই, বরং এই দুটির সম্মিলনে গড়ে ওঠা ব্যবস্থাপনায় আরও সর্বাত্মক ও দ্রুততর বিকাশ সুনিশ্চিত হতে পারে। বহুমুখী কৌশলের অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্র একদিকে শ্রম আইন সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে, অন্যদিকে রাজ্যগুলিকে উৎসাহ দিয়েছে শ্রমক্ষেত্রের সংস্কারে নিজস্ব প্রয়াস চালাতে। অপ্রয়োজনীয় দায়ভার না ভেবে তাঁদের যে সমগ্র প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে—একথা শ্রমিকদের বোঝাতে পারলে তবেই এই প্রচেষ্টায় সাফল্য আসবে।

২০১৪-১৫ সালের মধ্যবর্তী অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, শ্রম আইনের সংস্কার এবং দেশে ব্যবসা করার খরচ কমাবার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে একযোগে চেষ্টা চালাতে হবে। রাজস্থানে শ্রমসংস্কারের বিষয়টি রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য পাঠানো, এক্ষেত্রে কেন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপ। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যগুলির সামনেও নিদর্শন স্থাপন করা হল।

২০১৪-১৫ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষায় তো বটেই, অন্যান্য তথ্যসূত্র থেকেও স্পষ্ট, শ্রমশক্তি যে হারে বেড়েছে, কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি তার থেকে অনেক কম। জনগণনা অনুসারে, ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে শ্রমশক্তি বেড়েছে ২.২৩ শতাংশ, সেখানে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার ১.৪ শতাংশের কাছাকাছি। এজন্যই কর্মসংস্থানের হার দ্রুত বাড়ানো, বড়সড় এক নীতি সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ।

বর্তমানে শ্রম সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনের সংখ্যা ৪৪টি, রাজ্যগুলির ১০০টি; দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১২-১৭) বলা হয়েছে, 'কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে এতগুলি শ্রম আইন কারখানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের সহায়ক নয়।' শ্রমক্ষেত্রের ৮৪ শতাংশই অসংগঠিত হওয়ায় এই সব আইনের আওতার বাইরে। বাকি ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ সংগঠিত ক্ষেত্র, সর্বস্তরে আইনের চাপে হাঁসফাঁস করছে। যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, শ্রম আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'সার্বিকভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে অন্ততপক্ষে বস্ত্রবয়ন, চর্ম ও জুতো, গহনা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো শ্রমনিবিড় উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে চাহিদার ওঠানামার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমশক্তি স্থির করার অনুমোদন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়ের সঙ্গে আপস না করেও শ্রমের বাজারে নমনীয়তা আনা প্রয়োজন।'

শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগে শ্রমের মর্যাদা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পাশাপাশি সুশাসনের অঙ্গ হিসাবে সরকার শ্রমিক কল্যাণেও উৎসাহ দিতে চায়। সরকারের মন্ত্র হল 'শ্রমেব জয়তে'। কাজ তখনই উৎসবের চেহারা নেয়, যখন শ্রমিক এবং শিল্প, সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষই এর থেকে লাভবান হয়।

সংস্কারের লক্ষ্যে শ্রম মন্ত্রক শ্রম সংক্রান্ত আইনগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছে—মজুরি সংক্রান্ত, সুরক্ষা ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত, শিল্পগত সম্পর্ক সংক্রান্ত, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত এবং প্রশিক্ষণ ও বিবিধ সংক্রান্ত। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য শুনে এই বিধিগুলির খসড়া তৈরির জন্য একটি আন্তঃমন্ত্রকগোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে। শ্রম মন্ত্রক ইতিমধ্যেই এ নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বৈঠক শুরু করে দিয়েছে।

শ্রমমন্ত্রী এ পর্যন্ত তিনটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন। তৃতীয় বৈঠকটি হয়েছে চলতি বছরের ৬ মে। শিল্প-সম্পর্কগত বিধির খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক সংগঠন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তাবিত এই বিধিতে ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬, শিল্পগত কর্মসংস্থান (স্থায়ী নির্দেশ) আইন ১৯৪৬ এবং শিল্প বিবাদ আইন ১৯৪৭-এর বিভিন্ন ধারার সংস্কার ও সংযুক্তিকরণের কথা বলা হয়েছে। শিল্পমহল দীর্ঘদিন ধরেই শ্রম আইনগুলিকে নমনীয় করে তোলার দাবি জানাচ্ছিল। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলি মনে করত, এর ফলে শ্রমিকদের কাজের সুরক্ষা থাকবে না, ইউনিয়ন গড়ে তোলা কঠিন হবে। শ্রমমন্ত্রী এ বিষয়ে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মতামত ও

সুপারিশ আহ্বান করেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থ যেকোনও মূল্যে রক্ষা করা হবে এবং চূড়ান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে বলে মন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন।

এর আগে মজুরি সংক্রান্ত বিধির খসড়া প্রণয়নের উদ্দেশ্যেও দুটি বৈঠক হয়েছে। দ্বিতীয় বৈঠকটি হয় এ বছরের ১৩ এপ্রিল। অংশগ্রহণকারীরা ন্যূনতম মজুরি আইন ১৯৪৮, মজুরি প্রদান আইন ১৯৩৬, বোনাস প্রদান আইন ১৯৬৫ এবং সমমজুরি আইন ১৯৭৬-এর বিভিন্ন ধারার সংযুক্তিকরণ নিয়ে আলোচনা করেন। এখানেও শ্রমমন্ত্রী সব পক্ষের কাছ থেকে মতামত ও সুপারিশ চেয়েছেন।

এছাড়া কেন্দ্র এখন ছোট কারখানা (কর্মসংস্থান ও কাজের শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণ) বিল, ২০১৪-র খসড়া নিয়েও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালাচ্ছে। যেসব কারখানায় শ্রমিকসংখ্যা ৪০-এর কম, সেগুলি এই আইনের আওতায় আসবে। গত বছর শিক্ষানবিশ আইন, ১৯৬১-র সংশোধন করা হয়েছে, যাতে শিল্পমহল ও যুব সম্প্রদায়—দু' পক্ষের চাহিদার দিকেই সমান নজর রাখা যায়। এর আওতায় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বাইরের স্নাতক ও ডিপ্লোমাধারীদেরও আনা হয়েছে, শাস্তি হিসেবে শুধু জরিমানার সংস্থান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রজন্মের অর্থনৈতিক সংস্কারে রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে, এই বার্তা দিতে কেন্দ্র তিনটি শ্রম আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেতে রাজস্থান সরকারকে সাহায্য করেছে। এই তিনটি আইন হল শ্রম বিরোধ আইন, ১৯৪৭, চুক্তি শ্রমিক আইন, ১৯৭০ এবং কারখানা আইন, ১৯৪৭। শ্রম বিরোধ আইন সংশোধনের ফলে যে কারখানাগুলিতে ৩০০ জন পর্যন্ত শ্রমিক নিযুক্ত, যেখানে ছাঁটাই বা বরখাস্তের জন্য সরকারের আগাম অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন আর হবে না। এর আগে, ১০০ জন পর্যন্ত শ্রমিক যে কারখানাগুলিতে রয়েছে, তারা এই সুবিধা পেত। এই সংশোধনের ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে শিল্পপতিরা উৎসাহী হবেন। একশো জনের বেশি শ্রমিক হলেই ছোটখাট ব্যাপারেও সরকারের অনুমোদন নিতে হয় বলে তাঁদের একটা অনুযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ছিল। বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে এলে ক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র বিশেষ করে লাভবান হবে।

রাজস্থানে শিল্প বিরোধ আইনে আরও যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ছাঁটাই-এর পর প্রতিবাদ জানাতে চাইলে শ্রমিককে তিন মাসের মধ্যে তা নথিবদ্ধ করাতে হবে। আগে এর কোনও সময়সীমা ছিল না। অন্তত ৩০ শতাংশ শ্রমিক সদস্য হলে তবেই ইউনিয়ন গঠন করা যাবে। আগে এই হার ছিল ১৫ শতাংশ, কারখানা আইন কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিদ্যুৎবিহীন কারখানায় ৪০ জন শ্রমিক থাকলে এবং বিদ্যুৎ আছে এমন কারখানায় ২০ জন শ্রমিক থাকলে তা এই আইনের আওতায় আসবে। আগে এই সংখ্যা ছিল এর অর্ধেক। ২০ জন শ্রমিক আছে, এমন কারখানা আগে চুক্তি শ্রম আইনের আওতায় পড়ত। এখন এই ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। এর ফলে শিল্প সংস্থাগুলি আরও বেশি অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করতে পারবে। তাদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে না। রাজস্থান সরকারের এই উদ্যোগ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা-সহ অনেকের প্রশংসা পেয়েছে। বেশ কিছু রাজ্য রাজস্থানের পদাঙ্ক অনুসরণের কথা ভাবছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের বাজেটে এমন কিছু উদ্যোগ নিয়েছে, যা পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে দ্রুত কর্মসংস্থান হতে পারে। সরকার 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযানের সূচনা করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ভারতকে বিশ্বজনীন 'ম্যানুফ্যাকচারিং হাব'-এ পরিণত করার লক্ষ্যে নেওয়া বিস্তারিত কর্মসূচি। ভারতে লগ্নির জন্য উৎসাহ দিতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নীতিগুলি মসৃণ করা হয়েছে। মোদী সরকার তার প্রথম বছরেই আশা ও প্রতিশ্রুতির এক আবহ সৃষ্টি করেছে, একে সুচারুভাবে পূর্ণ করার দায়িত্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার।

২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী শ্রমেব জয়তে কার্যক্রমের সূচনা করেছেন। সুশাসনের অঙ্গ হিসাবে এতে ব্যবসা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের যুব সম্প্রদায়ের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে এসেছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সুশাসনের এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। ১৬ অক্টোবরই, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক সংযুক্ত ওয়েব পোর্টাল 'শ্রম সুবিধা'-র সূচনা করেছে। এই পোর্টালে মন্ত্রকের অধীন চারটি প্রধান সংস্থা—মুখ্য শ্রম কমিশনারের কার্যালয়, খনি সুরক্ষা সংক্রান্ত মহানির্দেশনালয়, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংস্থা এবং কর্মচারী বিমা সংস্থা সংযুক্ত রয়েছে।

এই পোর্টালের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনলাইনে নথিবদ্ধ করার সুবিধা দিতে প্রতিটি সংস্থার জন্য অনন্য 'লেবার আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার'—LIN বরাদ্দ করা হয়েছে। অনলাইন রিটার্ন জমা দিতে ব্যবস্থা রয়েছে স্বশংসয়িত সরল পদ্ধতির। অনেকগুলি রিটার্নের বদলে সংস্থাগুলিকে একটি সার্বিক রিটার্ন জমা দিতে হবে। স্বচ্ছ পরীক্ষণ ব্যবস্থায় লেবার ইন্সপেক্টররা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে অনলাইনে তাঁদের রিপোর্ট জমা দেবেন। কোনও অভিযোগ থাকলে পোর্টালে তার সময়বদ্ধ নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করা হবে। সাড়ে নয় লক্ষ সংস্থাকে ইতিমধ্যেই LIN বিলি করা হয়ে গেছে। আটটি শ্রম সংক্রান্ত আইনের সংস্থান মেনে একটিমাত্র রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়াও সম্প্রতি, চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে। এতে ব্যবসায়ের লেনদেন খরচ কমবে, সহজ হবে ব্যবসা পরিচালনা। ১৪টি বিধিবদ্ধ অনুমোদন এক জায়গায় পাওয়ার জন্য e-Biz পোর্টালও চালু হয়েছে।

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ গ্রামে বাস করে। তাই জনগোষ্ঠীগত সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যে একান্ত আবশ্যক, তা সরকার জানে। এজন্যই দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা চালু

হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য ২০১৫-১৬ সালের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ১৫০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় থাকা ছাত্রদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিজিটাল ভাউচারের মাধ্যমে সরাসরি টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা মোট শ্রমশক্তির ৯২ শতাংশ। অসংগঠিত শ্রমিক সামাজিক সুরক্ষা আইন, ২০০৮-এর আওতায় সরকার তাদের চিহ্নিতকরণ ও নথিবদ্ধকরণের কাজ শুরু করেছে। এজন্য একটি ডেটাবেস গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁরা যাতে সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা ভোগ করতে পারেন সেজন্য আধার সংখ্যা ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে যুক্ত করে একটি পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

সংগঠিত ক্ষেত্রে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষেরও বেশি শ্রমিককে সর্বজনীন (ইউনিভার্সাল) অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তাঁরা সংস্থা বদল করলেও ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের সুবিধা পেতে কোনও অসুবিধা হবে না। প্রতি মাসে জমা পড়া টাকা এবং মোট সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ জানিয়ে SMS অ্যালার্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এবং নির্মাণক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদেরও সর্বজনীন অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

পেনশন প্রাপকদের মাসিক ন্যূনতম ১ হাজার টাকা পেনশন সরকার সুনিশ্চিত করেছে। এখন প্রতি মাসের প্রথম দিনেই প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের কাছে তাঁদের পেনশন পৌঁছে যায়। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে মজুরির ঊর্ধ্বসীমা ৬৫০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০০০ টাকা করার একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। নতুন আর্থিক বছরের প্রথম দিন, অর্থাৎ ২০১৫ সালের ১ এপ্রিল ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের মোট ১২২টির মধ্যে ১০৩টি কার্যালয়ে ১৫ কোটি ৫৪ লক্ষ কর্মচারীর হিসাব আপডেট করা হয়েছে। এমন উদ্যোগ এই প্রথম।

জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই যুব সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় সরকার দক্ষতা উন্নয়নমূলক কর্মসূচি 'স্কিল ইন্ডিয়া' চালু করেছে। এজন্য গড়ে তোলা হয়েছে একটি পৃথক মন্ত্রক। যুব সম্প্রদায় ও শ্রমশক্তির প্রান্তিক অংশে থাকা মানুষজন যাতে শিল্পমহলের চাহিদা পূরণ করতে পারেন, সেজন্য গত এক বছর ধরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষানবিশ প্রোৎসাহন যোজনা ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর চালু হয়েছে। এর আওতায় আগামী আড়াই বছর ধরে এক লক্ষ শিক্ষানবিশের বৃত্তির অর্ধেক খরচ সরকার বহন করবে। আগামী কয়েক বছরে ২০ লক্ষ শিক্ষানবিশকে এর আওতায় আনা হবে। বৃত্তির পরিমাণ বাড়িয়ে অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের মজুরির সমান করা হয়েছে।

বাজেটে স্বনির্ভরতা ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে 'সেল্‌ফ-এপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্যালেন্ট ইউটিলাইজেশন' (SETU) শীর্ষক একটি নতুন ব্যবস্থাপনার ঘোষণা করা হয়েছে। কারিগরি ও অর্থনৈতিক উৎসাহ দানের এই কর্মসূচিতে নতুন ব্যবসা ও স্বনির্ভর প্রকল্পগুলিকে সবরকম সহায়তা দেওয়া হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে কারিগরি ক্ষেত্রের বিকাশে। NITI আয়োগের এই প্রকল্পের জন্য বাজেটে ১০০০ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিষেবাগুলির আধুনিকীকরণের কাজে হাত পড়েছে। চলতি বছরের মার্চে কাজ শুরু করেছে ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিসেস—(NCS)-এর আওতায় দেশে ১০০টি আদর্শ কেরিয়ার সেন্টার গড়ে তোলা হবে, যেখানে কর্মপ্রার্থীরা সব রকমের প্রশিক্ষণ পাবেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, ২০১৪-র ডিসেম্বরে NCVT-MIS পোর্টালের সূচনা। নির্মাণ ক্ষেত্রের অদক্ষ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিকে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ITI-গুলিতে শিক্ষার গুণমান বাড়াতে দূরশিক্ষার মাধ্যমে সেখানকার প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো হচ্ছে।

শ্রম সংক্রান্ত নীতি স্থির করতে সরকার ত্রিপাক্ষিক আলোচনার ওপর জোর দিয়েছে। গত ১৩ জানুয়ারি রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক বৈঠকে পৌরোহিত্য করার সময়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বন্দারু দত্তাত্রেয় বলেছেন, এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। পারস্পরিক আলোচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

মালিকরা সর্বসম্মতভাবে মনে করেন, শিল্পের উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন শ্রমিকদের স্বার্থও এর সঙ্গে মিলবে এবং সমগ্র বিষয়টিকে একটি সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে। কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিতীয়বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল চলতি বছরের ৩১ মার্চ। শ্রমমন্ত্রী এই বৈঠকে প্রস্তাবগুলির সম্পর্কে অন্যদের অবহিত করেন। EPF বা জাতীয় পেনশন প্রকল্প NPS-এর মধ্যে যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার বিকল্প শ্রমিকদের দেওয়ার প্রস্তাবও এর মধ্যে রয়েছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলি তাদের দীর্ঘদিনের বকেয়া দশ দফা দাবিপত্রের প্রসঙ্গ তুলে সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে আরও আলোচনার দাবি জানায়।

ভবিষ্যনিধি তহবিল আইনের আওতায় ন্যূনতম শ্রমিকের সংখ্যা ২০ থেকে নামিয়ে ১০-এ আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে উৎসাহ দান, অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য অনেকগুলি ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগের পথে যাবতীয় বাধা দূর করার সংস্থানও প্রস্তাবে রয়েছে। এই সংশোধনীগুলি আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ধারায় আরও স্পষ্টতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আনবে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিষয়ে সাধারণভাবে ঐকমত্য হয়েছে। EPF অথবা NPS-এর বিকল্প, শ্রমিকদের পছন্দের ক্ষেত্রকে আরও বাড়াবে বলে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন। আবার অনেকের মতে, EPFO-র সমান সুবিধা NPS দিতে না পারায় দুটি প্রকল্প সমকক্ষ নয়। বৈঠকে বলা হয়েছে, এই সংশোধন, ভারতীয় শিল্পকে আরও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলবে এবং ভারতকে ম্যানুফ্যাকচারিং হাব-এ পরিণত হতে সাহায্য করবে। ক্ষুদ্র সংস্থাগুলির জন্য আরও সাহায্য ও উৎসাহের দাবি উঠেছে। সরকার জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে আইন সংশোধনের চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করা হবে।❑

[লেখক প্রবীণ সাংবাদিক
email : deepakrazdan50@gmail.com]

জন সুরক্ষা প্রকল্প : সুনিশ্চিত সামাজিক নিরাপত্তা

বিমা ও পেনশন সংক্রান্ত তিনটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সূচনা হল গত ৯ মে, ২০১৫ তারিখে। সকলের কাছে সুলভে ও সহজ উপায়ে অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ। এই প্রকল্পের সুযোগ যাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকেই প্রকল্পের জন্য প্রদেয় প্রিমিয়াম কেটে নেওয়া হবে। গ্রাহককে নিজে থেকে আলাদা করে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

গত মাসে যে দুটি বিমা প্রকল্প চালু হয়েছে তার একটি হল প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY) এবং অন্যটি প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY)। এই দুটি প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও কারণে প্রকল্প গ্রহীতার মৃত্যু হলে বা দুর্ঘটনায় অঙ্গহানি ঘটলে বিমার সুযোগ পাওয়া যাবে। অন্যদিকে অটল পেনশন যোজনাটির (APY) লক্ষ্য হল পরিণত বয়সে তথা বার্ধক্যে নিয়মিত আয়জনিত সুরক্ষা প্রদান করা। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সুরক্ষা প্রকল্পগুলির জন্য খুবই অল্প টাকার সহজ প্রিমিয়ামের বিনিময়ে জীবন তথা দুর্ঘটনা বিমা এবং বার্ধক্যে নিয়মিত আয়জনিত সুযোগ লাভ করা যাবে।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা (PMSBY)

এই যোজনার আওতায় সকল সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গ্রাহকদের বছরে মাত্র ১২ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণে জীবন বা অঙ্গহানি ঘটলে দু' লক্ষ টাকার বিমার সুযোগ পাওয়া যাবে। তবে স্থায়ীভাবে আংশিক বিকলাঙ্গতার কারণে বিমার পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ টাকা। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গ্রাহকরা এই বিমার আওতায় আসবেন। রাষ্ট্রায়ত্ত সাধারণ বিমা সংস্থা এবং ইচ্ছুক ও আগ্রহী অন্যান্য সাধারণ বিমা সংস্থাগুলির মাধ্যমেও এই বিমা প্রকল্পগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোনও গ্রাহকের যদি একাধিক বা বহু সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে, তাহলে তিনি একটিমাত্র সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাহায্যেই এই বিমার সুযোগ লাভ করবেন। 'অটো ডেবিট' ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বিমার প্রিমিয়াম কেটে নেওয়া হবে। এজন্য অবশ্য গ্রাহককে একটি আবেদনপত্র পূরণ করে তাতে সম্মতি জানাতে হবে। এই প্রকল্পের সূচনা বর্ষে যদি কেউ এর সুযোগ গ্রহণ করতে নাও পারেন, পরবর্তী বছরগুলিতে প্রিমিয়ামের অর্থ জমা দিয়ে তিনি এই বিমার সুযোগ নিতে পারবেন। আবার, কোনও ব্যক্তি যদি প্রথমে এই প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করেও তা থেকে সাময়িকভাবে বেরিয়ে আসতে চান, তাহলেও পরবর্তীকালে কয়েকটি শর্ত পূরণ করে যে কোনও সময়ে আবার এই প্রকল্পে ফিরে আসতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা (PMJJBY)

এই যোজনার আওতায় ১৮ থেকে ৫০ বছর পর্যন্ত বয়সের যে কোনও ব্যক্তি তাদের সংশ্লিষ্ট সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জীবন বিমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন বছরে মাত্র ৩৩০ টাকা প্রিমিয়ামের বিনিময়ে। যে কোনও কারণে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে মনোনীত নমিনিকে দেওয়া হবে দু' লক্ষ টাকা। ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (LIC) বা আগ্রহী অন্যান্য জীবন বিমা সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই প্রকল্পের সুযোগ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে এক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে 'অটো ডেবিট' ব্যবস্থায় বিমার প্রিমিয়াম কেটে নেওয়া হবে। সূচনায় এই প্রকল্পে যোগদানে কেউ অপারগ হলেও পরবর্তীকালে যে কোনও সময়ে নিজের সুস্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দাখিল করে তিনি এই প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহক যদি জীবন বিমা সংক্রান্ত অন্যান্য পলিসিও গ্রহণ করে থাকেন, তাহলেও তিনি প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার (PMJJBY) সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

অটল পেনশন বিমা যোজনা (APY)

এই পেনশন প্রকল্পটি মূলত অসংগঠিত-ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ৬০ বছর বয়স থেকে প্রতি মাসে ১/২/৩/৪ বা ৫ হাজার টাকার নিয়মিত পেনশন লাভ করবেন। তবে পেনশনের অর্থের পরিমাণ নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের বেছে নেওয়া প্রিমিয়ামের ভিত্তিতেই। ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সে সর্বাধিক আর্থিক সুবিধাদানই এক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পে যোগদানের জন্য গ্রাহকের বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে। প্রিমিয়ামের অর্থ দেওয়া যাবে ২০ বছর পর্যন্ত বা প্রয়োজনে আরও বেশি সময়কাল ধরে। 'অটো ডেবিট' ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে প্রিমিয়ামের অর্থ জমা করে নেওয়া হবে। অটল পেনশন যোজনার (APY) সুযোগ গ্রহণের জন্য আধার একান্ত আবশ্যক না হলেও, গ্রাহকদের চিহ্নিত করার কাজে আধার নম্বরকে একটি প্রামাণ্য ও প্রাথমিক KYC নথি হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের স্বামী বা স্ত্রী এবং উত্তরাধিকারী তথা মনোনীত নমিনিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার কাজেও আধার নম্বরকে একটি প্রাথমিক নথি হিসেবে ধরা হবে যাতে পেনশনের অধিকার কার ওপর বর্তাবে তা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনও বিরোধ না দেখা দেয়। তাই এই প্রকল্পে যোগদানকারীকে তাঁর মনোনীত উত্তরাধিকারী তথা নমিনি সম্পর্কে বিশদ তথ্য পেশ করা বাধ্যতামূলক। যোগ্য কোনও ব্যক্তি একটিমাত্র অটল পেনশন যোজনা অ্যাকাউন্ট গ্রহণ করতে পারবেন, তার বেশি নয়। এই প্রকল্পে বিনিয়োগ ও লেনদেন সংক্রান্ত বিশদ তথ্য জানানো হবে সময়ে সময়ে প্রদেয় স্টেটমেন্ট বা বিবরণী মারফত।❑

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

জীববৈচিত্রের সুরক্ষা

জৈব সম্পদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা আজ বাড়ছে আর সেই কারণেই জৈব সম্পদ প্রযুক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্র এবং জৈব সম্পদ উৎপাদকদের স্বার্থের সংঘাতও বাড়ছে। উৎপাদকদের স্বার্থরক্ষার্থে নানা সভা-সম্মেলন আয়োজিত হচ্ছে, স্বাক্ষরিত হচ্ছে নানা চুক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে কি? বাদ সাধছে উন্নত ও ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলি। এ সম্পর্কে লিখছেন **অনিন্দ্য ভুক্ত।**

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। এটিই মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি এখনও সেদিকে পৌঁছোয়নি। তবুও বলা বাহুল্য, অব্যর্থ লক্ষ্যে সেদিকেই এগোচ্ছে। জীববৈচিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, আমাদের টনক আর নড়ছে না।

উদ্যোগ না বলে টনক বলাই ভালো। এমন তো নয় যে কোথাও কেউ উদ্যোগী হচ্ছে না। হচ্ছে। উনিশশো সত্তরের দশকের সেই বিখ্যাত স্টকহোম সম্মেলনের পর থেকেই তো মানুষের হুঁশ হয়েছে, পৃথিবী দূষিত হয়ে যাচ্ছে। তার পর থেকে সারা পৃথিবী জুড়েই হচ্ছে নানা সম্মেলন, বিবিধ চুক্তি। কিন্তু টনক নড়লে যেটা হয়, উদ্যোগ কার্যকরী হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে না। সম্মেলন হচ্ছে, পরিবেশদূষণ, জীববৈচিত্র ধ্বংস, এসব নিয়ে উদ্‌বেগের ফুলঝুরি জ্বলে উঠছে, আলোচনা শেষে চুক্তি হচ্ছে, ব্যাস, ওই পর্যন্তই, তারপর পৃথিবী তার নিজস্ব নিয়মে হাঁটছে। আমরাও এই নিয়ম মেনে একবার আলোচনা করব। দেখে নেব পৃথিবী জুড়ে জীববৈচিত্র ধ্বংস রুখতে কোথায় কী হচ্ছে, হয়েছে, কী-ই বা তার পরিণতি।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগ : জীববৈচিত্র সম্মেলন

জীববৈচিত্রের অস্তিত্ব ও তার প্রবহমানতা প্রাথমিকভাবে পরিবেশের স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে যে কোনও উদ্যোগই তাই পরোক্ষে জীববৈচিত্র ধ্বংসের বিরুদ্ধে গৃহীত উদ্যোগ হিসেবে ভাবা চলে। তবে তার বাইরে সরাসরি জীববৈচিত্র সুরক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক আলাপ-আলোচনা, চুক্তি স্বাক্ষর প্রভৃতি হয়েছে। এই ব্যাপারে যে সম্মেলনটিকে জীববৈচিত্র সুরক্ষার জন্য একটি সুসংহত সম্মেলন হিসেবে ভাবা চলে, সেটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯২ সালে, রিও সম্মেলনের একটি অংশ হিসেবে। সম্মেলনটি জীববৈচিত্র সম্মেলন (কনভেনশন অন বায়োডাইভার্সিটি) নামে পরিচিত। জীববৈচিত্র সম্মেলন ছাড়া এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রধান সম্মেলন ও চুক্তির বর্ণনা আমরা সঙ্গের সারণিগুলিতে হাজির করছি, কিন্তু আমাদের চলতি নিবন্ধটি সীমাবদ্ধ থাকবে জীববৈচিত্র সম্মেলন নিয়েই।

জীববৈচিত্র সম্মেলনের প্রাথমিক উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছিল রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কার্যসূচি ইউনেপ-এর তত্ত্বাবধানে। পৃথিবীর যে বিপুল জীববৈচিত্র তা মানবজাতির ভবিষ্যৎ আর্থনীতিক ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাকে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা দরকার। অথচ, সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা তো দূরের কথা, যে হারে মানুষের বেহিসেবি কর্মকাণ্ডে জীববৈচিত্র দ্রুত অন্তর্হিত হচ্ছে, তা রীতিমতো উদ্‌বেগজনক। এই ধ্বংসলীলাকে অবিলম্বে বন্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া দরকার, এমন একটি ভাবনা থেকেই ইউনেপ ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে জীববৈচিত্র সুরক্ষার লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করে তার বৈঠক ডাকে। কমিটির নাম দেওয়া হয় 'অ্যাড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ অব এক্সপার্টস্ অন বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি'। এই বৈঠকের পরই ১৯৮৯ সালের মে মাসে গঠন করা হয় 'অ্যাড হক ওয়ার্কিং গ্রুপ অব টেকনিক্যাল অ্যান্ড লিগাল এক্সপার্টস্'। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের উপর জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ ও তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে একটি আন্তর্জাতিক আইনি চুক্তির খসড়া তৈরি করার ভার দেওয়া হয়। এই বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দুটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নজর রাখতে বলা হয়। এক, জীববৈচিত্র সংরক্ষণের এই কাজের ব্যয় ও সুবিধাকে উন্নত ও বিকাশশীল দেশের মধ্যে কীভাবে ভাগ করা হবে এবং দুই, কোনও এলাকার স্থায়ী মানুষের নিজস্ব যে সমস্ত উদ্ভাবন, যাকে আমরা চিরায়ত জ্ঞান (ট্র্যাডিশনাল নলেজ) বলি, তাকে সুরক্ষা দেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি কী হবে। এই ওয়ার্কিং গ্রুপ (১৯৯১ সাল নাগাদ যেটি ইনটার-গভর্নমেন্টাল নেগোশিয়েটিং কমিটি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে) জীববৈচিত্র চুক্তির যে খসড়াটি তৈরি করে, সেটি ১৯৯২ সালের মে (২২ মে) মাসে নাইরোবি সম্মেলনে গৃহীত হলে ওই বছরেরই জুন

CITES (কনভেনশন অন ইনটারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড্ স্পিশিস)

বিপন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের বাণিজ্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। একটি আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী পৃথিবীতে জীবনের প্রথম স্পন্দনের পর এ পর্যন্ত ১০ কোটি প্রজাতির প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে, আর বর্তমানে টিকে আছে তার মাত্র ১ শতাংশের মতো, অর্থাৎ ১০-১২ লক্ষ প্রজাতি। এই যে বিপুল সংখ্যক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেল, তার অধিকাংশই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে হলেও মানুষের লোভের শিকার হয়ে হারিয়ে যেতে হয়েছে এমন সংখ্যাও কম নয়। হাতির দাঁতের লোভে হাতির চোরাশিকার বা চামড়ার লোভে বাঘ, হরিণের বেআইনি শিকার তো প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এইভাবে চলতে থাকলে এইসব বন্যপ্রাণীও যে অচিরেই বিপন্নপ্রায় প্রজাতির তালিকায় চলে যাবে, তা বলা বাহুল্য। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ১৯৭৩ সালে পৃথিবীর আশিটিরও বেশি দেশ এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশগুলি বিপন্ন বা বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির যে কোনওরকম বাণিজ্যিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং সম্ভব হলে পুরোপুরি বন্ধ করে দেবার উদ্যোগ নেবে। প্রয়োজন হলে আইন প্রণয়নও করবে। ১৯৭৩ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে। বস্তুত এই পৃথিবীর বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতি বিপন্ন হয়ে পড়ছে চোরাশিকারি ও চোরাচালানকারীদের উপদ্রবে। এই চুক্তিতে বিপন্ন প্রজাতিসমূহকে দু-ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে বিপন্ন হতে বসেছে এমন সমস্ত প্রজাতি। দ্বিতীয় ভাগে রাখা হয়েছে তাদের, যাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ জারি না করা হলে তারা অচিরেই বিপন্ন হয়ে পড়বে। প্রথম শ্রেণিভুক্ত প্রজাতিসমূহের ক্ষেত্রে যে কোনওরকম বাণিজ্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত প্রজাতিসমূহের ক্ষেত্রে অবশ্য নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, এই চুক্তি জীববৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

মাসে রিও সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থিত দেশগুলির সামনে হাজির করা হয়। ১৯৯৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট ১৬৮টি দেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এইসব আন্তর্জাতিক চুক্তি অবশ্য স্বাক্ষরের পরই আইনগত বৈধতা পায় না। পায় ন্যূনতম সংখ্যক দেশ তাদের দেশে চুক্তিটিকে আইনগত স্বীকৃতি দেবার পর। ১৯৯৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৩০টি দেশ চুক্তিটিকে মান্যতা দেবার পর জীববৈচিত্র চুক্তিটি কার্যকরী হয়।

জীববৈচিত্র সম্মেলন তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। ঘোষণা করা হয় এই সম্মেলনের লক্ষ্য হবে—(১) জীব-বৈচিত্রের সংরক্ষণ, (২) জিন সম্পদ ও অন্যান্য জৈব সম্পদের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার এবং (৩) জীববৈচিত্রের সুবিধাটির সমবণ্টন। জীববৈচিত্রের ক্ষয় ও তার সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা বিচ্ছিন্নভাবে আগেও হয়েছে, তবে জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ যথাযথভাবে করতে হলে জিন সম্পদের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও তার থেকে যে সুবিধা পাওয়া যায়, সেটির বণ্টনে বিশেষ গুরুত্ব যে আরোপ করা দরকার সেটি প্রথম আলোচিত হয় জীববৈচিত্র সম্মেলনে। তাই বর্তমান নিবন্ধে জীববৈচিত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় লক্ষ্য দুটিকে নিয়েই আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে দু-একটি কথা বলে নেব সম্মেলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে।

জীববৈচিত্র সম্মেলন একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়েই তার দায়িত্ব সমাপ্ত করতে চায়নি। যে তিনটি লক্ষ্যের কথা চুক্তিতে বলা হয়, সেগুলির সঠিক রূপায়ণের জন্য যে নিরন্তর কাজ চালিয়ে যাওয়া দরকার, সেটা বুঝে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি প্রতি বছর আলোচনায় বসবে বলে ঠিক করে। এই আলোচনা পর্বের, যেগুলি সদস্য সম্মেলন নামে পরিচিত, প্রথমটি ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে বাহামাসে সংগঠিত হয়েছিল। ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলেও তারপর থেকে প্রতি দু-বছর অন্তর এই সম্মেলন হচ্ছে। প্রতিটি সম্মেলনেই আলোচ্য বিষয়-তালিকাতে মূল লক্ষ্যগুলিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। জৈব সম্পদের সুরক্ষা এবং তার ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুবিধার সমবণ্টনের বিষয়গুলি নিয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, পরবর্তীকালে তা সবই এই সদস্য সম্মেলনে আলোচনার ফলশ্রুতি।

বন সম্মেলন (১৯৭৯)

বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী প্রাণী (স্থলচর, জলচর ও খেচর) প্রজাতির সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক একটি চুক্তি। চুক্তিটি ইউনেপ-এর উদ্যোগে স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭৯ সালে, কার্যকর হয় ১৯৮৩ সাল থেকে। জার্মানির বন শহরে স্বাক্ষরিত হবার কারণে বন সম্মেলন নামেই পরিচিত হলেও চুক্তিটির প্রকৃত নাম 'কনভেনশন অন দ্য কনজারভেশন অব মাইগ্রেটরি স্পিশিস অব ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালস্'। সংক্ষেপে যেটিকে বলা হয় 'কনভেনশন অন মাইগ্রেটরি স্পিশিস' বা পরিযায়ী প্রজাতি সম্মেলন। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলি ঐকমত্য হয়েছিল যে, কোনও পরিযায়ী প্রাণী তার জীবনের বিভিন্ন সময় যে সমস্ত দেশে অতিবাহিত করে, সেই সমস্ত দেশকে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগী হয়ে ওই প্রাণী প্রজাতিকে সুরক্ষা দিতে হবে।

বন সম্মেলনের একটি সাংগঠনিক কাঠামো আছে। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী যে সমস্ত দেশ, যাদের বলা হচ্ছে 'কনফারেন্স অব পার্টিজ', তারাই এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী অঙ্গ। তিন বছর অন্তর এই সদস্য দেশগুলি মিলিত হয় সম্মেলনের কাজকর্ম ও অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য। এই ত্রৈ-বাৎসরিক মিটিংয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কাজ চালানোর জন্য আছে স্ট্যান্ডিং কমিটি।

এই চুক্তির পরিশিষ্ট অংশে আছে দুটি তালিকা। প্রথম তালিকায় আছে সেইসব পরিযায়ী প্রাণীর নাম, যারা বিপন্ন, যাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য আশু উদ্যোগ দরকার। দ্বিতীয় তালিকায় আছে অন্যান্য পরিযায়ী প্রাণীদের নাম। তিন বছর অন্তর যখন সদস্য দেশসমূহ মিলিত হয়, তখন এই তালিকা দুটি প্রয়োজনমতো সংশোধন করে। ২০১৪ সালের শেষে এসে বন সম্মেলনের সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশো কুড়িতে।

কার্টেজিনা চুক্তি

জৈব সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। জীববৈচিত্র সম্মেলনের প্রথম বিশেষ সদস্য সম্মেলনে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই বিশেষ সদস্য সম্মেলনটির সূত্রপাত কলোম্বিয়ার কার্টেজিনা শহরে (ফেব্রুয়ারি ২২-২৩, ১৯৯৯) হলেও শেষ হয় কানাডার মন্ট্রিল (ফেব্রুয়ারি ২৪-২৮, ২০০০) শহরে। মন্ট্রিলেই চূড়ান্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় ১৩৫টি দেশের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে। আধুনিক জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা যে সমস্ত জিন পরিবর্তিত সজীব বস্তু উপহার দিয়েছে, সেই সমস্ত জীবের উপস্থিতি জীববৈচিত্রকে যে সম্ভাব্য বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, তা থেকে তাকে রক্ষা করতেই এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

আধুনিক জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পূর্ণ নতুন কোনও জীব সৃষ্টি করেছে এমনটি নয়। যেটা করেছে সেটা হল, বর্তমান কোনও জীবের দেহে নতুন জিন প্রতিস্থাপন করে ভিন্ন চরিত্রের কোনও সজীব বস্তু তৈরি করেছে। এটা ঘটেছে মূলত উদ্ভিদ ও অণুজীবের ক্ষেত্রে। কিন্তু এই নতুন উদ্ভিদ বা অণুজীবগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবে, বা তা প্রাকৃতিক জীববৈচিত্রকে আহত করবে কি না, তা আগাম বুঝে ওঠা যাচ্ছে না বলে এইসব উদ্ভিদের বীজ বা অণুজীবগুলির (মূলত ওষুধ তৈরির জন্য সেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে) ব্যবহারের সঙ্গে একটা বিপদের সম্ভাবনা সবসময় থেকেই যাচ্ছে। এই বিপদের সম্ভাবনা আরও বাড়ে যখন যে দেশে এগুলি তৈরি করা হয়েছে এবং যে দেশের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে কি না পরীক্ষা করা হয়েছে, সে দেশ থেকে অন্য দেশে রপ্তানি করা হয়। এই কারণেই কার্টেজিনা চুক্তির উদ্দেশ্য নতুন জীবসমূহের 'নিরাপদ সীমানা-অতিক্রান্ত স্থানান্তর ও ব্যবহারকে উপযুক্ত সুরক্ষা দেওয়া'।

এই সুরক্ষা দেবার কাজে চুক্তির প্রধান হাতিয়ার আগাম জ্ঞাপন চুক্তি (অ্যাডভান্সড ইনফরমেশন এগ্রিমেন্ট) সংক্রান্ত ধারাটি। এই ধারা অনুযায়ী কোনও দেশ যখন তার জিন পরিবর্তিত সজীব বস্তুটি অন্য কোনও দেশে রপ্তানি করবে, তখন প্রথমবার রপ্তানির আগে তাকে আমদানিকারক দেশটিকে ওই সজীব বস্তুর গুণাগুণসমূহ আগাম জানাতে হবে। সবকিছু বিস্তারিতভাবে জানার পর আমদানিকারক দেশটি আবার তার সম্মতি বা অসম্মতি জানাবার জন্য ২৭০ দিন সময় পাবে। এই আগাম জ্ঞাপনের বিষয়টি অবশ্য কেবলমাত্র প্রথমবার রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দ্বিতীয়বার থেকে এটির পুনরাবৃত্তি করার আর প্রয়োজন পড়বে না।

জিন সম্পদের সুরক্ষা

জীব সম্পদসমূহকে সুরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় তার আর্থনীতিক মূল্যকে স্বীকৃতি দেওয়া। জীববৈচিত্র সম্মেলনের মূল ভাবনা ছিল এটিই। তাই জীব সম্পদের ব্যবহারকে সুরক্ষা দেওয়া ও সেই সম্পদকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের পর তা থেকে যে আয় হবে, সেই আয়কে জীব সম্পদের মালিক ও তার ব্যবহারকারীর মধ্যে সমবণ্টনের প্রশ্নটিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল এই সম্মেলন। জীব ও তার জিনের মালিক হিসেবে রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছিল জীববৈচিত্র সম্মেলন।

জীববৈচিত্রের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ তা পরিবেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে। কিন্তু জীববৈচিত্রের সুরক্ষা প্রসঙ্গে জিন সম্পদের উপর এত গুরুত্ব আরোপ কেন? কারণ, জিনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সেই অসীম সম্ভাবনা, যা মানবজাতির কল্যাণের কাজে লাগতে পারে। এই অসীম সম্ভাবনা, বলা বাহুল্য, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, যে সম্ভাবনার লোভেই বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র সংরক্ষণের এই উদ্যোগ।

জীব তথা জিন বৈচিত্রের এই বিপুল সম্ভাবনার কথা আমরা যাদের কাছ থেকে জানতে পারি তারা কিন্তু সমাজের পিছিয়ে পড়া, বলতে গেলে প্রায় নিরক্ষর কিছু জনগোষ্ঠী, যাদের আমরা আদি জনগোষ্ঠী হিসেবে চিনি। এরাই বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে মানুষকে গাছগাছড়া চিনিয়েছে। চিনিয়েছে

কোনটি খাদ্য আর কোনটি অখাদ্য, জানিয়েছে কোন গাছের কী ওষধি গুণ। এদের এই উদ্যোগ এখানেই থেমে থাকেনি। কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জন্ম দিয়েছে নতুন সংকর প্রজাতির সব বীজও। সমৃদ্ধ হয়েছে মানুষের খাদ্য ও ওষুধের সম্ভার। এই জ্ঞানকে বলা হচ্ছে চিরায়ত জ্ঞান।

যারা চিরায়ত জ্ঞানের মালিক, তারা কিন্তু এইসব জ্ঞানের কোনও মালিকানা কখনও দাবি করেনি। তারা তাদের জ্ঞান কখনও লিপিবদ্ধ করেনি, শ্রুতির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছে নিজেদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে। এ কথা যেমন ঠিক, তেমনই এ কথাও ঠিক যে তাদের জ্ঞানের এই সুফল কিন্তু সবাই ভোগ করেছে। চিরায়ত জ্ঞান, জিন সম্পদ— এইগুলি তাই কখনও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পৌঁছোয়নি। পৌঁছোল, যখন জিন প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের করায়ত্ত হল।

কোনও জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চা সহজেই বাণিজ্যিকভাবে সফল হয়ে ওঠে যদি কৃষিক্ষেত্রে তার প্রয়োগ ঘটে। এর একটা কারণ যেমন জীবিকার সূত্রে অসংখ্য মানুষের কৃষির সঙ্গে যোগ, অপর কারণটি তেমনি জীবনধারণের প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষের কৃষির উপর নির্ভরশীলতা। ধনতান্ত্রিক দুনিয়া তাই কৃষিবীজের মধ্যেই বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনাকে নিহিত থাকতে দেখেছিল। তাদেরই উদ্যোগে তাই ১৯৬০ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির নাম 'দ্য ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব নিউ ভ্যারাইটিস অব প্ল্যান্টস্' (বা ইউগভ)। এই চুক্তি নতুন রকম বীজের উপর উদ্ভাবকের অধিকারকে কার্যত সম্পত্তির অধিকার দেয়। চুক্তি অনুযায়ী নতুন বীজ যদি কেউ ব্যবহার করতে চায়, তবে তাকে আগে উদ্ভাবকের কাছে অনুমতি নিতে হবে এবং উদ্ভাবককে উপযুক্ত রয়ালটি দিতে হবে। ছাড় দেওয়া হয় চাষিদের এবং বীজ-গবেষকদের। বীজ-গবেষক মানে যারা জৈব প্রযুক্তির সাহায্যে গবেষণাগারে এক বীজ থেকে অন্য বীজ উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে।

অতঃপর জৈব প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই রক্ষাকবচের সঙ্গে জৈব দস্যুতার ঘটনা ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। ভৌগোলিক কারণেই জীববৈচিত্রের প্রধান ধাত্রীভূমি দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি, যারা আবার ঘটনাচক্রে অনুন্নত। ফলে জৈব দস্যুতার প্রধান শিকারও হতে শুরু করে এরাই। ইউগভের রক্ষাকবচের বিরুদ্ধে তাই এরা অচিরেই সরব হয়ে উঠতে শুরু করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালে ফাও (ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন) তার বাইশতম অধিবেশনে জিন সম্পদকে 'মানবজাতির সার্বজনীন উত্তরাধিকার' হিসেবে ঘোষণা করে। তবে শুধু প্রকৃতিলব্ধ বীজ নয়, গবেষণালব্ধ বীজকেও একই মর্যাদা দেওয়ায় ঘোরতর আপত্তি তোলে উন্নত বিশ্বের প্রতিনিধিরা।

আপত্তি তোলার অবশ্য সংগত কারণ ছিল। সংগত বলছি এই কারণে যে, বণিকের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত লাগলে সে প্রতিবাদ করবেই। সারা পৃথিবী জুড়েই জিন পরিবর্তিত সজীব বস্তু (প্রধানত বীজ) নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল বহুজাতিক কোম্পানিগুলি। এই গবেষণা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। স্বাভাবিকভাবেই এত খরচের পর তার ফসলকে যদি বিনা প্রতিদানে হাতছাড়া করতে হয়, তাহলে সেটা কারও পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয় না। বহুজাতিক কোম্পানিগুলিরও হয়নি। আর এইসব বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই যেহেতু বকলমে নিয়ন্ত্রণ করে উন্নত দেশগুলিকে, সেহেতু ফাওয়ের ঘোষণা হজম হয়নি উন্নত বিশ্বেরও।

উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের এই স্বার্থের সংঘাতকে প্রশমিত করতে জিন সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে যথার্থ পদক্ষেপটি নেয় জীববৈচিত্র সম্মেলন। জিন সম্পদের উপর রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বীকৃতি

সারণি-১
জীববৈচিত্র চুক্তি—সদস্য সম্মেলন

সদস্য সম্মেলন	স্থান ও কাল	মূল আলোচ্য বিষয়
প্রথম	নাসাও, বাহামাস (নভেম্বর ২৮—ডিসেম্বর ৯, ১৯৯৪)	১. সম্মেলনের আর্থিক গঠন ২. মধ্যমেয়াদি কর্মসূচি
দ্বিতীয়	জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া (নভেম্বর ৬-১৭, ১৯৯৫)	১. সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র ২. জৈব সুরক্ষা
তৃতীয়	বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেন্টিনা (নভেম্বর ৪-১৫, ১৯৯৬)	১. কৃষি জীববৈচিত্র ২. মেধা সম্পদ অধিকার
চতুর্থ	সাতিস্লাভা, স্লোভাকিয়া (মে ৪-১৫, ১৯৯৮)	১. অন্তর্দেশীয় জলজ বাস্তুতন্ত্র ২. চিরায়ত মান ৩. সুবিধার বণ্টন
প্রথম (বিশেষ)	কার্টেজিনা, কলম্বিয়া (ফেব্রুয়ারি ২২-২৩, ১৯৯৯) ও মন্ট্রিল, কানাডা (ফেব্রুয়ারি ২৪-২৮, ২০০০)	১. জৈব সুরক্ষা
পঞ্চম	নাইরোবি, কেনিয়া (মে ১৫-২৬, ২০০০)	১. শুষ্ক, নিরক্ষীয়, তৃণভূমি ও সাভানা বাস্তুতন্ত্র ২. জিন সম্পদ
ষষ্ঠ	হেগ, নেদারল্যান্ডস্ (এপ্রিল ৭-১৯, ২০০২)	১. বনভূমি বাস্তুতন্ত্র ২. সুবিধার বণ্টন ৩. ২০০২-১০-এর কৌশলগত পরিকল্পনা
সপ্তম	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া (ফেব্রুয়ারি ৯-২০, ২০০৪)	১. পর্বত বাস্তুতন্ত্র ২. সংরক্ষিত অঞ্চল ৩. প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রযুক্তিগত সহায়তা
অষ্টম	কুরিতিবা, ব্রাজিল (মার্চ ২০-৩১, ২০০৬)	১. দ্বীপভূমি বাস্তুতন্ত্র ২. সুবিধার বণ্টন
নবম	বন, জার্মানি (মে ১৯-৩০, ২০০৮)	১. উদ্ভিদ সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী কৌশল ২. বনভূমি বাস্তুতন্ত্র
দশম	নাগোয়া, জাপান (অক্টোবর ১৮-২৯, ২০১০)	১. সুবিধার বণ্টন
একাদশ	হায়দরাবাদ, ভারত (অক্টোবর ৮-১৯, ২০১২)	—
দ্বাদশ	পিয়ংচ্যাঙ, দক্ষিণ কোরিয়া (অক্টোবর ৬-১৭, ২০১৪)	—
ত্রয়োদশ (আসন্ন)	লস ক্যাবোস, মেক্সিকো (নভেম্বর, ২০১৬)	—

দেবার অর্থ সেই দেশের অগণিত কৃষককুলের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, যাদের ঘামরক্তের ফসল এই জিনবৈচিত্র। জিন সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথা বললেও উদ্ভাবকের অধিকার প্রসঙ্গে কোনও কথা বলেনি জীববৈচিত্র সম্মেলন। জীববৈচিত্র চুক্তি ও ইউগভ চুক্তি, দুটি চুক্তিই পাশাপাশি বজায় থাকার অর্থ অতএব জিন সম্পদ আহরণ করে নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে হলে যেমন গবেষককে মালিক দেশটিকে রয়ালটি দিতে হবে, তেমনই আবার উদ্ভাবকের উদ্ভাবিত বীজকে কেউ ব্যবহার করতে চাইলে তাকেও উপযুক্ত রয়ালটি দিতে হবে গবেষককে। কিন্তু জীববৈচিত্র সম্মেলনের এমন সদর্থক ভাবনাকেও বিশেষ আমল না দিয়ে সারা বিশ্ব জুড়ে ইউগভ মডেলটিকেই চালু করতে চাইছে উন্নত বিশ্ব। এই ব্যাপারে তাদের হাতিয়ার বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপ্স চুক্তিটি। শেষ পর্যন্ত জিত কার হবে, তা এখনও পর্যন্ত অমীমাংসিত। আর অমীমাংসিত বলেই বিভিন্ন দেশে একই বিষয়ে বিভিন্ন আইন হচ্ছে, যা পরস্পরবিরোধী হয়ে উঠছে। ভারতের বীজ আইন ও পেটেন্ট আইনের মধ্যেই এই স্ববিরোধিতার স্পষ্ট নমুনা পাওয়া যাবে।

সুবিধার সমবণ্টন

জীব সম্পদের উপর রাষ্ট্রের এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অধিকারের সূত্রেই সুবিধার সমবণ্টনের প্রশ্নটি ওঠে। ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র চুক্তি যখনই এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, তখনই কীভাবে এই বণ্টনের বিষয়টিকে কার্যকর করে তোলা যাবে সে বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। বিভিন্ন সদস্য সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনাও শুরু হয়। অবশেষে ২০১০ সালে জাপানের নাগোয়া শহরে অনুষ্ঠিত দশম সদস্য সম্মেলনে এই ব্যাপারে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নাগোয়া প্রোটোকল নামে পরিচিত এই চুক্তিটি অবশ্য এখনও কার্যকর হয়নি। না হবার কারণ, ২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখার পর ঠিক হয়েছিল, চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটি দেশ যতক্ষণ না নিজের দেশে চুক্তিটির অনুমোদন করিয়ে উঠতে পারছে ততক্ষণ তা কার্যকরী হবে না।

নাগোয়া চুক্তি দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিল। প্রথমত, কোনও দেশের জিন সম্পদ বা কোনও জনগোষ্ঠীর ওই জিন সম্পদ ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞান ব্যবহার করতে চাইলে আগাম অনুমতি নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এগুলির ব্যবহার থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাবে, তা কোন শর্তে ভাগাভাগি হবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে।

সরকারিভাবে সুবিধার সমবণ্টন কোনও দেশেই শুরু হয়নি নাগোয়া চুক্তি কার্যকর না হওয়ায়। তবে বিভিন্ন দেশে, বিশেষত চিরায়ত জ্ঞানের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে সুবিধার সমবণ্টন বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয়েছে। এর কারণ, জৈব সম্পদের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। তবে এই উদ্যোগ এতই বিচ্ছিন্ন, সংখ্যায় এতই নগণ্য, যে তা কোনও আশার আলো জ্বালায় না। বস্তুত, যতক্ষণ না এইসব উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় স্তরে সংগঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ তা বৃহদাকার ধারণ করবে না। সমস্যা হচ্ছে, শুধু তো জৈব সম্পদের ব্যবহার নয়, অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের নির্বিচার ব্যবহারের সঙ্গে এত বেশি বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত যে, এই সুবিধাগুলি কোনও দেশই সহজে হাতছাড়া করতে চায় না, এর ফলে আগামী দিনে বিপদ সুনিশ্চিত জেনেও চায় না। যতদিন রাষ্ট্রব্যবস্থা এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ছেড়ে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থের কথা না ভাবতে শিখবে, ততদিন আলোচনা হবে, চুক্তি হবে আর দিনের শেষে এসব হবে অশ্বডিম্ব।❑

[লেখক আরামবাগ কলেজের অর্থনীতি বিভাগে সহকারী অধ্যাপক।]

সারণি-২
জীববৈচিত্র চুক্তি বনাম ট্রিপ্স চুক্তি

জীববৈচিত্র চুক্তি	ট্রিপ্স চুক্তি
জীব সম্পদ (যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত জিন সম্পদও)-এর উপর রাষ্ট্রের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।	জীব সম্পদকে ব্যক্তিগত মেধা সম্পদের ফসল বলে মনে করে।
জীব সম্পদের ব্যবহার থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাবে, তার সমবণ্টনের কথা বলে।	সমবণ্টন সংক্রান্ত কোনও আলোচনা নেই।
কোনও জীব সম্পদ যে রাষ্ট্রের সম্পত্তি ব্যবহার করার আগে সে দেশের অনুমতি নেবার কথা বলে। অনুমতি এমনকী নিতে হবে ওই সম্পদের আদি ব্যবহারকারী গোষ্ঠীর হাত থেকেও।	আগাম অনুমতি সংক্রান্ত কোনও ধারা নেই।
জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও তার দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে সরকার।	ব্যক্তিগত মেধার অধিকারকে বজায় রেখে সাধারণ নাগরিকের স্বার্থকে, বিশেষত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখবে।

নাগোয়া চুক্তি

জিন সম্পদের ব্যবহার এবং সেই ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সুবিধাকে ওই জিন সম্পদের মালিকের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে ভাগ করে নেবার নিয়মনীতি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি। জীববৈচিত্র সম্মেলনের দশম সদস্য সম্মেলনে (নাগোয়া, জাপান, ১৮-২৯ অক্টোবর, ২০১০) এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিটির পুরো নাম 'নাগোয়া প্রোটোকল অন অ্যাকসেস টু জেনেটিক রিসোর্সেস অ্যান্ড দ্য ফেয়ার ইকুয়েটেব্‌ল শেয়ারিং অব বেনিফিট অ্যারাইজিং ফ্রম দেয়ার ইউটিলাইজেশন'।

নাগোয়া চুক্তি দুটি বিষয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধার সমবণ্টনের কথা বলেছে। এক, জিন সম্পদ এবং দুই, জিন সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত চিরায়ত জ্ঞান। যে জীববৈচিত্র সম্মেলনের অঙ্গ হিসেবে নাগোয়া চুক্তির উদ্ভব, সেই জীববৈচিত্র সম্মেলন জিন সম্পদকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ফলে অন্য কোনও দেশের জিন সম্পদ ব্যবহার করলে যেমন মালিক দেশটিকে সম্পদের ব্যবহার থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ভাগ দিতে হবে, তেমনই জিন সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত চিরায়ত জ্ঞানকে ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুবিধার ভাগ দিতে হবে। সুবিধার ভাগটি দু-ভাবে দেওয়া যেতে পারে—আর্থিক সুবিধার আকারে, অর্থ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে। আর্থিক আকারে বলতে রয়ালটির আকারে বা লভ্যাংশের আকারে। অর্থ ছাড়া অন্য কোনও উপায় বলতে সম্পদটি গবেষণার কাজে লাগিয়ে সেই গবেষণা থেকে যে তথ্য পাওয়া গেছে, সেই তথ্যটি বা যে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করা গেছে, সেই প্রযুক্তির জ্ঞানটিকে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সুবিধার সমবণ্টনের প্রশ্নে নাগোয়া চুক্তি দুটি বিষয়ের উপর জোর দিতে বলেছে। একটিকে বলা হচ্ছে আগাম অনুমতি, অন্যটিকে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত শর্তাবলি। কোনও দেশের জিন সম্পদ বা কোনও জনগোষ্ঠীর জ্ঞান ব্যবহার করতে গেলে আগাম অনুমতি যেমন নিতে হবে, তেমনই ব্যবহার থেকে যে সুবিধা পাওয়া যাবে, তা কীভাবে ভাগাভাগি হবে তা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ঠিক করতে হবে।

নাগোয়া চুক্তি প্রাথমিকভাবে স্বাক্ষরিত হয় ২০১০ সালের ২৯ অক্টোবরে। অতঃপর ২০১১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সেটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল স্বাক্ষরের পর অন্তত পঞ্চাশটি দেশ তাদের দেশে চুক্তিটিকে আইনি স্বীকৃতি দেবার পর সেটি কার্যকর হবে।

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১৬ মার্চ ২০১৫—১৫ মে ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **দফায় দফায় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপাল :**

২৫ ও ২৬ এপ্রিলের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর থেকেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত নেপাল। দফায় দফায় পরবর্তী-কম্পন (আফটার-শক্)। তার সঙ্গে ধস, তুষারপাত আর প্রবল বৃষ্টি উদ্ধারকাজ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এরই মধ্যে ২৫ ও ২৬ এপ্রিলের পর ১২ মে ফের বড়সড় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এ পর্যন্ত নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা আট হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। নেপাল সরকারের হিসেব অনুযায়ী, সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ ছ'হাজারেরও বেশি বাড়ি। সতেরো দিনে তিনটি ভূমিকম্প ও শতাধিক পরবর্তী কম্পনের ধাক্কায় প্রভাবিত হয়েছে ভারত-সহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশও।

● **সিঙ্গাপুরের রূপকারের প্রয়াণ :**

মারা গেলেন আধুনিক সিঙ্গাপুরের রূপকার লি কুয়ান ইউ। বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। নিউমোনিয়ায় ভুগছিলেন লি। ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ভর্তি ছিলেন সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুঙ্গ (লিয়ের বড়ছেলে) এক টিভি বার্তায় ২৩ মার্চ সকালে তাঁর বাবার মৃত্যুর খবর দেশবাসীকে জানান।

দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর দেহ ২৫ থেকে ২৮ মার্চ পার্লামেন্ট হাউসে শোয়ানো ছিল। শেষকৃত্য হয় ২৯ মার্চ। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বের এক ঝাঁক নেতা লিয়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ প্রায় চব্বিশটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রতিনিধি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন।

● **জামাত নেতা কামারুজ্জামানের ফাঁসি :**

একাত্তরে মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত জামাতে ইসলামির অন্যতম শীর্ষ নেতা মহম্মদ কামারুজ্জামানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করল বাংলাদেশ সরকার। ১১ এপ্রিল স্থানীয় সময় রাত ১০টা ১ মিনিটে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে বলে ঘোষণা করেছেন ঢাকার পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান।

একাধিক খুন, গণহত্যা, ধর্ষণ ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনায় আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আদালত তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার পরে কামারুজ্জামান সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিলেন। পাঁচ দিন আগে সর্বোচ্চ আদালতও তাঁর আপিল খারিজ করে দেয়। কিন্তু জামাতে ইসলামির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কামারুজ্জামান (৬৫) রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করতে অস্বীকার করেন। তার পরে এ দিনই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হল।

● **জঙ্গিমুক্ত শহরে গণকবরের সন্ধান :**

দামাসাক শহরের একটি সেতুর তলা থেকে একশো মানুষের গণকবরের সন্ধান পেল নাইজেরীয় সেনাবাহিনী। বোকো হারাম জঙ্গিদের কবল থেকে তখন সবেমাত্র শহরটিকে মুক্ত করে সেনা শুরু করেছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ। সেনাবাহিনীর দাবি, ওই এলাকাতেই কারও গলা কেটে, কারও আবার মাথা কেটে ব্রিজের তলায় কবর দিয়েছিল বোকো হারাম জঙ্গিরা।

নাইজেরিয়ার মাটিতে কট্টরপন্থী ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠী বোকো হারামের তাণ্ডব নতুন কিছু নয়। এক সময় নাইজেরিয়ার একটি স্কুল থেকে ছাত্রী-শিক্ষিকা মিলিয়ে দুশোর বেশি বাসিন্দাকে অপহরণ করে খবরের শিরোনামে উঠে আসে ওই জঙ্গিগোষ্ঠী।

● **তিউনিসিয়ায় জাদুঘরে হামলায় নিহত ২১ :**

এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে ১৭ জন বিদেশি পর্যটককে হত্যা করল সেনার পোশাক পরা এক দল বন্দুকবাজ। ১৮ মার্চ দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসের বার্দো জাদুঘরে।

সেদিন দুপুরে পার্লামেন্টে সন্ত্রাসবিরোধী আইন নিয়ে আলোচনার সময়ে প্রথম গুলির শব্দ পাওয়া যায়। গুলি চালনার পরে কয়েক জন পর্যটককে জাদুঘরের মধ্যে পণবন্দি করে দুষ্কৃতীরা। লড়াই-পালটা লড়াইয়ে দুই আততায়ী, পর্যটক, পুলিশকর্মী-সহ ২১ জন নিহত হন। হতদের মধ্যে রয়েছেন জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যান্ড এবং স্পেনের কয়েক জন নাগরিক।

● **আল্পসে ভাঙল বিমান :**

ফের মাঝ আকাশে বিমান বিপর্যয়। ২৪ মার্চ বার্সেলোনা থেকে ডাসেলডর্ফ যাওয়ার পথে ১৫০ জন আরোহী নিয়ে আল্পস পর্বতের দুর্গম এলাকায় ভেঙে পড়ল জার্মানউইঙ্গসের এয়ারবাস এ৩২০।

ফ্লাইট ৪ইউ৯৫২৫-এর কো-পাইলট অ্যান্ড্রিয়াস লুবিৎজ-ই নাকি এ দুর্ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন বলে প্রমাণ মিলেছে। মানসিক অসুস্থতার কথা সম্পূর্ণ গোপন করে ককপিটে উঠেছিলেন লুবিৎজ—এ কথা জানিয়েছেন জার্মান তদন্তকারী অফিসাররা। এয়ারবাস এ-৩২০-র ভয়েস রেকর্ডার থেকে জানা গিয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবেই পাইলটকে ককপিটের ভিতরে ঢুকতে না দিয়ে ১৪৯ জন যাত্রী নিয়ে আল্পসের বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন লুবিৎজ।

● **কেনিয়ার ছাত্রাবাসে জঙ্গি হানায় নিহত ১৪৭ :**

কেনিয়ার গারিসা ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রাবাসের ডর্মেটরিতে ৩ এপ্রিল সকালে আচমকাই শুরু হয় গুলিবর্ষণ। উত্তর-পূর্ব কেনিয়ার গারিসা শহরের কলেজের ছাত্রাবাসে জঙ্গি হামলায় ১৪৭ জন পড়ুয়া নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন কেনিয়া সরকারের অফিসারেরা। আহত প্রায় ৮০ জন। নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে ৪ জন জঙ্গি নিহত হয়েছে। সোমালিয়ার সীমান্ত লাগোয়া গারিসা শহরে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে সোমালিয়ার আল শাবাব জঙ্গিগোষ্ঠী।

এই দেশ

● **অধিকার বলেই নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ :**

প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন—এবার ভারত নিজের অধিকারের জোরেই রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যপদ পেতে চায়। পাশাপাশি মনে করিয়ে দিলেন, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ভারতের ভূমিকা ইতিহাস অস্বীকার করতে পারে না। এমনকী বর্তমানেও সে ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছে এই দেশ।

নয়াদিল্লির যুক্তি, এখন যারা নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য, তারা বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছবির সবটা তুলে ধরতে পারে না। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতও গুরুত্বপূর্ণ। শুধু আজ নয়, অতীত থেকেই। তবে শান্তির ঐতিহ্য থাকলেও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পেতে কেন এখনও ভারতকে কাকুতিমিনতি করতে হয়, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। এও জানিয়ে দেন, এর পর থেকে আর আর্জি-অনুরোধ করবে না ভারত। বরং নিজের অধিকার চাইবে।

● **২৬/১১ মুম্বই হামলার প্রধান চক্রীর মুক্তি :**

প্রত্যাশামতোই ২৬/১১ মুম্বই হামলার প্রধান চক্রী জাকিউর রহমান লকভি মুক্তি পেলেন ১১ এপ্রিল। আর সেই খবর ছড়াতেই ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনা।

যদিও লকভি মুক্তির দায় প্রকারান্তরে ভারতের উপরেই চাপিয়েছে পাকিস্তান। পাক বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্রের বক্তব্য, মুম্বই সন্ত্রাসের বিচারে সহযোগিতার প্রশ্নে ভারত অতিরিক্ত দেরি করেছে। যার ফলে লকভির বিরুদ্ধে মামলা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এই মুক্তির নির্দেশের খবর পাওয়ামাত্র কড়া ভাষায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। পাকিস্তানে ভারতের হাই কমিশনার টি সি এ রাঘবন দেখা করেন পাক বিদেশসচিব আইয়াজ আহমেদ চৌধুরির সঙ্গে। লকভির মুক্তি নিয়ে ভারতের অসন্তোষ ব্যাখ্যা করে তাঁকে জানানো হয়।

● **রান্নার গ্যাসে ভরতুকি ছাড়ছেন সচ্ছলরা :**

ভারতে এখনও পর্যন্ত সাড়ে তিন লক্ষ উচ্চবিত্ত মানুষ রান্নার গ্যাসে সরকারি ভরতুকি না নেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। এর ফলে যে টাকা সাশ্রয় হবে, সেটা সরাসরি গরিব মানুষের জন্য ব্যবহার করা হবে।

ধনীরাও কেন ভরতুকি দেওয়া রান্নার গ্যাস ব্যবহার করবে—এই প্রশ্ন তুলে উচ্চবিত্তদের স্বেচ্ছায় ভরতুকি ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর সেই অনুরোধই যে কাজ করতে শুরু করেছে।

● **ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদী হানা :**

ছত্তীসগঢ়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু-দুবার আক্রমণ চালাল মাওবাদীরা। সুকমার পিড়মেল-পোলামপল্লি এলাকায় মাওবাদীদের হামলায় নিহত হন রাজ্য পুলিশের সাত জওয়ান (১২ এপ্রিল)। ১২ জন জওয়ান আহতও হন। ১৩ এপ্রিল খনি-সমৃদ্ধ কাঁকের জেলায় আকরিক লোহা বোঝাই ১৮টি ট্রাক পুড়িয়ে দিয়েছে তারা।

ছত্তীসগঢ়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক খনির কাজ নতুন নিলামের পরে দ্রুত শুরু করতে চাইছে কেন্দ্র ও রাজ্য। কাঁকের-সুকমার মতো এলাকায় তার বিরুদ্ধেই সক্রিয় হয়েছে মাওবাদীরা।

● **উত্তরপ্রদেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় :**

অসময়ের ঝড়বৃষ্টিতে বিপুল পরিমাণ শস্য নষ্ট হয়েছে। তার জেরে একের পর এক চাষির মৃত্যুর খবর উঠে আসছে। পরিস্থিতি বিচার করে এবার উত্তরপ্রদেশে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়' ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

উত্তরপ্রদেশ প্রশাসন সূত্রে খবর, অসময়ের ঝড়বৃষ্টির জেরে প্রায় ৫৫টি জেলায় চাষাবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ ডালজাতীয় শস্য ও গম খেতেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যে সব কৃষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারদের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন অখিলেশ যাদব।

● **'অপারেশন রাহত'-এর সাফল্য :**

ইয়েমেন থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৪,৫০০ ভারতীয়কে উদ্ধার করা গিয়েছে বলে দাবি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের। যার মধ্যে এ দিনই ৪৫০ জনকে সানা থেকে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে ভারতে আনা হয়েছে। 'অপারেশন রাহত' অব্যাহত রাখতে অল-হুদাইদহ বন্দরে নোঙর করেছিল ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ আইএনএস সুমিত্রা। সব ভারতীয়কে দেশে ফেরাতে সজাগ বায়ুসেনাও।

যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ভারতীয় বাহিনী যেভাবে উদ্ধার কাজ চালিয়েছে, তার প্রশংসা শোনা গিয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। কারণ, উদ্ধারে ভারতের সাহায্য চেয়েছে অন্তত ২৬টি দেশ। নিজেদের নাগরিকদের উদ্ধারের পাশাপাশি ৩২টি দেশের অন্তত ৪০৯ জনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় সেনা। আবার, ১১ জন ভারতীয় পাক বিমানে দেশে ফিরলেন ৯ এপ্রিল।

● **নতুন নির্বাচন কমিশনার :**

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আঁচল কুমার জ্যোতি। তিনি ২০১০ সালে গুজরাতের মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বর্তমানে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নাসিম জাইদি। ২০১৭ সালে অবসর নেবেন। নির্বাচন কমিশনারের দু'টি খালি পদের একটিতে আঁচল কুমার জ্যোতির নিয়োগ হওয়ায় জাইদির পরে 'সিনিয়রিটি'-র ভিত্তিতে তাঁর জায়গা নেবেন তিনি। সে ক্ষেত্রে আগামী লোকসভা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ওই আমলা।

এই রাজ্য

● **পুর-নির্বাচনের ফল :**

পুর-নির্বাচনে বিপুল জয়লাভ করেছে শাসক দল। ৭১টি পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। বামফ্রন্ট ৫টি ও কংগ্রেস ৪টি পুরসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। ১২টি পুরসভার ফলাফল অমীমাংসিত। পুর-নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয় ২৮ এপ্রিল।

● **উচ্চশিক্ষায় নিজ পরিচয়েই ঠাঁই তৃতীয় লিঙ্গের :**

রাজ্যের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির আবেদনপত্রে পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে সঙ্গে এবারেই প্রথম 'অন্যান্য' শব্দবন্ধনী থাকছে লিঙ্গ হিসেবে। এবং ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই তা চালু হয়ে যাবে। বিভিন্ন কলেজের কর্তৃপক্ষও একই পথ অনুসরণ করতে চলেছে। এবার 'তৃতীয় লিঙ্গ'-র ব্যক্তিরা নিজেদের পরিচয়েই ভর্তির আবেদন করতে পারবেন।

দেশের প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকারের কথা বলে ভারতের সংবিধান। তা সত্ত্বেও চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে হিজড়ে ও রূপান্তরকামীরা কেন 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে আবেদন করতে পারবেন না, সেই বিতর্ক দীর্ঘদিনের। গত বছরের এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এই সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্ন ও বিতর্কের অবসান ঘটে।

● **ঋতু বদলে দক্ষিণবঙ্গে চাষের ক্ষতি :**

ঋতু বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় সংকট তৈরি হয়েছে চাষে। বৈশাখ আসতে না আসতেই কালবৈশাখীর দাপটে দক্ষিণবঙ্গে চাষের জমিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

আচমকা ঝড় ও সেই সঙ্গে শিলাবৃষ্টিতে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। শিলাবৃষ্টির জেরে আমের পাশাপাশি ক্ষতি হয়েছে বোরো চাষেও। নষ্ট হয়েছে মাচার সবজিও।

এ দিকে আর এক বিপত্তি পোকার আক্রমণ। বৃষ্টি থামার পরে চড়া রোদের সঙ্গে আর্দ্রতা বাড়লেই শুরু হচ্ছে পোকার আক্রমণ। এর ফলে চাষে আরও বিপর্যয় আসতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। প্রাথমিক অবস্থায় কীটনাশক হিসাবে নিমের তেল ব্যবহারেরও পরামর্শ দিয়েছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

● **শ্রমিকদের বকেয়া মেটাতে প্রথম লোক আদালত রাজ্যে :**

শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাগন্ডা মেটাতে রাজ্যে প্রথম লোক আদালত বসল হুগলির চন্দননগরে। দীর্ঘদিন ধরেই শ্রমিকদের বকেয়া গ্র্যাচুইটি নিয়ে নানা জুটমিল ও অন্য কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উঠছিল। তা নিয়ে দেশের নানা মহল থেকে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানানো হয়। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশেই বসল এই লোক আদালত।

রাজ্যের বিভিন্ন জুটমিল ও অন্যান্য সংস্থায় অন্তত ৩০ হাজার শ্রমিকের গ্র্যাচুইটি পাওনা রয়েছে। বিশেষ করে হুগলি, হাওড়া, নদীয়া ও দুই ২৪ পরগনায় এই সংখ্যাটা খুবই বেশি। বহু মানুষ সুপ্রিম কোর্টে তাঁদের অসহায়তার কথা জানিয়েছেন। এ দিন ৩৭টি মামলার শুনানি হয়। এর মধ্যে ৩৪টিই গোন্দলপাড়া জুটমিলের। বাকিগুলি অন্যান্য সংস্থার।

● **চুক্তিতে আলু চাষের পরামর্শ হাইকোর্টেরও :**

এ রাজ্যের আলু চাষিদের সংকট কাটাতে চুক্তি চাষের পরামর্শ দিল হাইকোর্ট। আলু চাষিদের সমস্যা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে ১০ এপ্রিল প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর বলেন—পাঞ্জাবের মতো চুক্তি চাষ করলে এ রাজ্যেও আলু চাষিরা লাভবান হতে পারেন। এছাড়া এই সংকট কাটাতে বৈজ্ঞানিক পরিকাঠামো ও বিজ্ঞানসম্মত চাষ জরুরি বলে মনে করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতি জানান, কী দামে উৎপাদিত ফসল কেনা হবে, বহুজাতিক সংস্থাগুলি পাঞ্জাবের চাষিদের সঙ্গে আগেই তা নিয়ে চুক্তি করে নেয়। তারা যে ধরনের বীজ ব্যবহার করতে বলে, যে পদ্ধতিতে চাষ করতে বলে, সেই পদ্ধতি মেনে পাঞ্জাবের চাষিরা চাষ করেন। এতে ফসলের গুণগত মানও ঠিক থাকে।

● **চটকলের সমস্যা মেটাতে ত্রিপাক্ষিক কমিটি :**

চটকলের সমস্যা নিয়মিত খতিয়ে দেখতে বিশেষ ত্রিপাক্ষিক কমিটি গড়ছে রাজ্য। তাতে পাটশিল্পের ২২টি ইউনিয়নের প্রতিনিধি ছাড়া রাজ্য সরকার ও চটকল মালিকদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। কমিটি গড়তে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ৩০ এপ্রিল শ্রমিক ও মালিকপক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। প্রস্তাবিত কমিটির চেয়ারম্যানও হবেন মলয়বাবু। প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ইএসআই ইত্যাদির টাকা মেটানো নিয়ে চটকলের সমস্যাগুলির সমাধান করাই হবে এর প্রধান কাজ।

অর্থনীতি

● **ঘোষণার ৫০ দিনের মধ্যে চালু মুদ্রা ব্যাংক :**

বাজেটে ঘোষিত মুদ্রা ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মনে করিয়ে দিলেন, ঘোষণার ৫০ দিনের মধ্যে ব্যাংকের উদ্বোধন সম্ভব হল।

৫ কোটি ৭৫ লক্ষ মানুষ নিজেদের রোজগারের ব্যবস্থা করেছেন। সব মিলিয়ে ১১ লক্ষ কোটি টাকার পুঁজিতে তাঁরা কাজ করেন, ১২ কোটি মানুষের কর্মসংস্থানেরও বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ উদ্যোগীর মাত্র ৪ শতাংশ ব্যাংক থেকে ঋণ পান। এঁদের জন্যই মুদ্রা (মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইন্যান্স এজেন্সি) কাজ করবে।

● **ভারতেই কারখানা গড়তে চায় এয়ারবাস :**

ভারতের বাজারে শুধু বিক্রি নয়, বিশ্বের বড় শিল্প সংস্থাগুলির উৎপাদনও যাতে এ দেশের মাটিতেই হতে পারে, সে জন্য 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগান তুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই ভাবনা নিয়েই ১২ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী পৌঁছেছিলেন ফ্রান্সের তুলুসে, এয়ারবাস-এর শিল্প কারখানায়।

কূটনীতির আলোচনার বৃত্তের বাইরে গিয়ে একটি শিল্পসংস্থার কারখানায় প্রধানমন্ত্রীর এভাবে পৌঁছে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই ফ্রান্সের শিল্পমহলকে উৎসাহিত করে তুলেছে। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে যাত্রীবাহী বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাটির সিইও টম এন্ডারস জানিয়েছেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র ভাবনাকে সমর্থন জানিয়ে ভারতের মাটিতে কারখানা গড়তে তাঁরা আগ্রহী। সেখানে বিমান তৈরি করে ভারত ও বিশ্বের অন্য দেশগুলিতে বিক্রি করার কথা ভাবা যেতে পারে।

● **অর্থনীতির দুর্বলতা নিয়ে হুঁশিয়ারি এস অ্যান্ড পি-র :**

মূল্য বৃদ্ধির হার কমে আসা, ঊর্ধ্বমুখী শিল্পোৎপাদন, শেয়ার বাজারের চাঙ্গা ভাব—সব মিলিয়ে ভারতের অর্থনীতির হাল ফেরা নিয়ে উচ্ছ্বাসের মধ্যেই ১৪ এপ্রিল হুঁশিয়ারি দিল আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'স্ট্যান্ডার্স অ্যান্ড পুওর্স' (এস অ্যান্ড পি)। তবে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার সরকারি ব্যয় ২৫ শতাংশ বাড়ানোর যে পরিকল্পনা নিয়েছে, তার প্রশংসা করেছে এস অ্যান্ড পি। ২০১১-১২ থেকে তা বাড়ছিল মাত্র ৫.৪ শতাংশ হারে।

প্রসঙ্গত, তার আগের সপ্তাহে আর এক মূল্যায়ন সংস্থা মুডিজ রেটিং না-বাড়ালেও আচমকাই ভারত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি 'স্থিতিশীল' থেকে 'ইতিবাচক' করেছে।

● **ন'মাসে সর্বোচ্চ শিল্প বৃদ্ধির হার :**

কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, বাড়তি খনিজ উত্তোলন এবং মূলধনি পণ্যের চাহিদা বাড়া। মূলত এই তিন কারণে ভর করেই গত ফেব্রুয়ারিতে ৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে শিল্প বৃদ্ধির হার। ন'মাসের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে কেন্দ্র প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আলোচ্য মাসে কল-কারখানায় উৎপাদন (উৎপাদন শিল্প) বেড়েছে ৫.২ শতাংশ। যেখানে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বৃদ্ধি তো দূর, বরং সরাসরি তা কমে গিয়েছিল ৩.৯ শতাংশ। একই ধরনের ছবি মূলধনি পণ্যের শিল্পেও। আগের বছরের ফেব্রুয়ারিতে এই পণ্যের উৎপাদন কমে ছিল ১৭.৬ শতাংশ। সেখানে এবার বেড়েছে ৮.৮ শতাংশ।

● **আলাদা নিয়ন্ত্রক নির্মাণ শিল্পে :**

নির্মাণ শিল্পে সাধারণ ক্রেতাকে সুরক্ষিত রাখতে সংশোধিত বিলে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। রিয়েল এস্টেট (রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) বিল-এ অনুমোদন দিয়ে এই ক্ষেত্রের উপর নজরদারির জন্য আলাদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গড়তে বলল মন্ত্রীসভা। বাণিজ্যিক প্রকল্প ও বসবাসের আবাসন, সবই এর আওতায় আসবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে। এছাড়া যে সমস্ত চালু প্রকল্পে এখনও শেষ হওয়ার শংসাপত্র মেলেনি, সেগুলিকেও নয়া বিলের শর্ত মেনে তিন মাসের মধ্যে ওই নিয়ন্ত্রকের অধীনে নথিভুক্ত হতে হবে।

● **রফতানিতে উৎসাহ ৫ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতিতে :**

আগামী ২০২০ সালের মধ্যে রফতানি দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে পাঁচ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করল কেন্দ্র। ক্রমেই বাড়তে থাকা বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্স-এর পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি বড় পদক্ষেপ।

ই-কমার্সে গুরুত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি, এমন সব শিল্পকে রফতানিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছে কেন্দ্র। গোটা ব্যবস্থাটি যাতে দ্রুত করা যায়, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতর। এক লাফে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের রফতানিতে বাড়তি উৎসাহ মিলবে বলে সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে।

● **কে ভি কামাথ ব্রিকস ব্যাংকের প্রথম কর্ণধার :**

ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) ব্যাংকের প্রথম কর্ণধার হিসেবে কে ভি কামাথের নাম ঘোষণা করল কেন্দ্র। কামাথ আইসিআইসিআই ব্যাংককে সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি কাজ করেছেন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকও। প্রশস্ত করেছেন ইনফোসিসে নেতৃত্ব বদলের পথও।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **হৃদ্‌রোগে 'ড্রোন' প্রযুক্তির ব্যবহার :**

কার্ডিও মায়োপ্যাথি রোগটা নিয়ে হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞদের দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তবে আশার আলো দেখিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কলেরা অ্যান্ড এন্টেরিক ডিজিজেস'-এর একটি যৌথ গবেষণা। তাতে 'ড্রোন' প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানীরা। ওই উড়ুক্কু যানে করে ওষুধ পৌঁছে যাবে শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে। সারিয়ে তুলবে অসুখ। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঘটবে না অন্য কোনও অঙ্গে।

হৃৎপিণ্ডের ভিতরে থাকা এক ধরনের কোষ (কার্ডিও মায়োসাইট) ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ায় যত দিন যায়, ততই যেন কমে যায় বুকের ধুকপুকুনি। এই রোগ সারানোর কোনও অস্ত্রোপচার নেই। ভরসা তাই ওষুধেই রোগটা কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা। তবে সেই ওষুধের

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অকেজো হয়ে পড়তে পারে কিডনি, লিভার।

● **হেপাটাইটিস সি ঠেকাতে নয়া ওষুধ :**

হেপাটাইটিস সি হওয়া মানেই যে সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়, তারও যে ওষুধ রয়েছে এবং সেই ওষুধ ক্রমশ নাগালের মধ্যে আসতে চলেছে সে নিয়ে চর্চা চলছিল বেশি কিছু দিন ধরেই।

শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক, ড্রাগ কন্ট্রোল এবং একাধিক ওষুধ সংস্থার মিলিত উদ্যোগে বিষয়টি সম্ভব হয়েছে। আমেরিকায় যে ওষুধের দাম পড়ে ৫০ লক্ষ, এ দেশে সেটাই এক লাখেরও কম দামে মিলতে চলেছে বলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর। উল্লেখ্য এ দেশে প্রায় এক কোটি মানুষ হেপাটাইটিস সি রোগে আক্রান্ত।

● **সৌরজগতে জলের সন্ধান :**

একই সপ্তাহে পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই গবেষকদল দাবি করল, সৌরজগতের দু'-দু'টি উপগ্রহে জলের অস্তিত্ব রয়েছে। এক, বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমিড-এ। আর দুই, এনসেলাডাস, শনির উপগ্রহে।

বহির্বিশ্বে প্রাণের সন্ধান সেই কবেই শুরু করেছে বিজ্ঞানীকূল। টেলিস্কোপে চোখ রেখেছে সৌরজগতের বাইরেও। যদিও দীর্ঘ পরীক্ষানিরীক্ষার পর এত দিনেও তেমন কোনও জোরদার ইঙ্গিত মেলেনি। প্রমাণ মিলল হঠাৎই। তা-ও এই সৌর-সংসারেই।

গ্যানিমিডের খবরটা এনেছে নাসার দূরবীক্ষণ যন্ত্র হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ। হাব্লের দেওয়া তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে জার্মানির কোলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বলছেন, গ্যানিমিডের পৃষ্ঠে বরফের চাদরের তলায় লুকিয়ে রয়েছে নোনা জলের ভাণ্ডার। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে 'দ্য জার্নাল অব জিওফিজিক্যাল রিসার্চ : স্পেস ফিজিক্স'-এ। চাঞ্চল্যকর এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার দিন কয়েক আগেই আবার বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'নেচার'-এ কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দাবি করেছেন, শনির উপগ্রহ এনসেলাডাসেও জল থাকতে পারে।

খেলার জগৎ

● **বিশ্বের এক নম্বর সাইনা :**

প্রথম ভারতীয় মেয়ে হিসেবে বিশ্বের এক নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা হয়ে ইতিহাস তৈরি করলেন সাইনা নেহওয়াল। ২০১০ সালের পর চীনাদের বাইরে কেউ এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। তিনি নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ওপেন সুপার সিরিজের প্রথম ফাইনালেও উঠলেন জাপানের য়ুই হাসিমোতোকে (২১-১৫, ২১-১১) হারিয়ে। ফাইনালে সাইনার সামনে প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ইন্দোনেশিয়ার রত্নাচক ইন্তানন। ভারত থেকে এর আগে প্রকাশ পাড়ুকোন বিশ্বের এক নম্বর তারকা হয়েছিলেন।

বিশ্বের প্রাক্তন ২ নম্বর এবং বর্তমানে অষ্টম রত্নাচক ইন্তাননের বিরুদ্ধে শুরু থেকে কখনওই নড়বড়ে দেখায়নি। প্রথম গেমে নিজের শক্তিশালী স্ম্যাশ এবং ইন্তাননের কিছু 'আনফোর্সড এরর'-এর সৌজন্যে সাইনা এগিয়ে যান (১১-৫)। তার পর ব্যবধান কমিয়ে আনেন ইন্তানন (১০-১২)। এর পর সাইনা মারাত্মক লড়ে পর পর পয়েন্ট তুলতে থাকেন। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে সাইনা এগিয়ে যান (৫-০)। তবে ইন্তানন সাইনাকে আর ধরতে পারেননি।

ছেলেদের সিঙ্গলসে জয় পেলেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। প্রথম গেমে পিছিয়ে পড়েও জিতলেন। ডেনমার্কের ভিক্টর অ্যাক্সলসেনকে হারালেন ১৮-২১, ২১-১৩, ২১-১২-তে।

● **মেয়েদের ডাবলসে এক নম্বর সানিয়া :**

মেয়েদের ডাবলসে এখন বিশ্বের এক নম্বর সানিয়া মির্জা। মার্টিনা হিঙ্গিসের সঙ্গে জুটি বেঁধে ডব্লিউটিএ ফ্যামিলি সার্কল কাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই সানিয়া এক নম্বর হলেন।

সানিয়াই প্রথম ভারতীয় মেয়ে, যিনি এই সম্মান পেলেন। ভারতীয় টেনিস ইতিহাসে অবশ্যই এটি অন্যতম সেরা সাফল্য হিসেবে ধরা হবে। গত মার্চেই সানিয়া মির্জার সঙ্গে জুটি বাঁধেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর মার্টিনা হিঙ্গিজ।

প্রসঙ্গত, অতীতে মিক্সড ডাবলসে তিন বার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের কৃতিত্বও আছে সানিয়ার। ডাবলসে গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালে উঠেছেন ২০১১ সালে ফরাসি ওপেনে। ফাইনালে কাসে ডেলাকুয়া ও ডারিজা জুয়াক জুটিকে হারিয়েছেন সানিয়ারা। চ্যাম্পিয়ান হয়ে সানিয়া ৪৭০ পয়েন্ট পান। মোট পয়েন্ট ৭৯৬৫। তিনি পিছনে ফেলে দিলেন সারা ইরানি (৭৬৪০) ও রবার্ট ভিন্সিকে (৭৬৪০)।

● **আজলান শাহ হকিতে ভারতের ব্রোঞ্জ :**

চ্যাম্পিয়ান না হতে পারলেও আজলান শাহ হকিতে সম্মানজনক পারফরম্যান্স করল ভারতীয় হকি টিম। দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন সর্দার সিং, পারাত্তু শ্রীজেশরা।

ইপোতে দুই দক্ষিণী প্লেয়ারের দাপটই সাফল্য দিল ভারতকে। দক্ষিণ কোরিয়া মানে গতির ঝড়। এশিয়ার অন্যতম শক্তি কোরিয়ানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে নেমেছিল হকি ইন্ডিয়া। এশিয়ান গেমসে এর আগে কোরিয়াকে হারালেও এই আজলান শাহতেই কয়েক দিন আগে হেরেছে ভারত। তাদেরই টাইব্রেকারে হারালেন সর্দাররা।

● **বিশ্বকাপ অস্ট্রেলিয়ার :**

একদিবসীয় ক্রিকেট বিশ্বকাপের দুই আয়োজক অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ফাইনালে খেলল আর ঘরের মাঠে ফাইনাল খেলা অস্ট্রেলিয়াই ট্রফি নিয়ে গেল। মাইকেল ক্লার্ক আর স্টিভ স্মিথ জীবনের শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ, তাও আবার বিশ্বকাপ ফাইনালে দেশকে কাপ জিতিয়ে অবসরের চিত্রনাট্য নিজের পছন্দমতো লেখার সুযোগ পেলেন। কাপজয়ী অধিনায়ক হিসেবে অ্যালান বর্ডার, স্টিভ ওয়, রিকি পন্টিংদের সঙ্গে একাসনে নিজের নামটাও লিখিয়ে ফেললেন মাইকেল ক্লার্ক।

গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে মিচেল স্টার্ক ২২টা উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছেন।

বিবিধ সংবাদ

● **চিড়িয়াখানা থেকে উধাও ৪ গেকো :**

সদ্য তৈরি হওয়া চিড়িয়াখানার সরীসৃপ ভবনে ১৯ মার্চ সকালে বিভিন্ন সরীসৃপের খাঁচা পরিষ্কার করতে গিয়ে রক্ষীরা দেখেন, 'টোকে গেকো'র (গেকোনিডাই) খাঁচা পড়ে আছে। বাসিন্দারা কেউ নেই। শুরু হয় খোঁজ। চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, বিকেল পর্যন্ত আশপাশের গাছগাছালি থেকে তক্ষক প্রজাতির ওই প্রাণীর সাতটি উদ্ধার হলেও চারটি নিখোঁজ। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন চিড়িয়াখানা-কর্তৃপক্ষ।

বছর ছ'য়েক আগে (২০০৯-এ) চিড়িয়াখানা থেকে খোয়া গিয়েছিল আটটি মার্মোসেট বাঁদর। ফের সেই স্মৃতিই ফিরে এল চিড়িয়াখানার সরীসৃপ ভবনে।

● **মারা গেলেন গুন্টার গ্রাস :**

জার্মানির লিউবেক শহরের হাসপাতালে ৮৭ বছর বয়সে মারা গেলেন জার্মান সাহিত্যিক, গুন্টার গ্রাস (১৩ এপ্রিল)। 'দ্য টিন ড্রাম'-এর নোবেলজয়ী লেখক যে শেষ কয়েক বছর শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন।

গ্রাস 'ফ্রি সিটি অব ডানজিগ' (বর্তমান জিডানস্কে, পোল্যান্ড) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫০-এর দশকে লেখালেখি শুরু করেন। গুন্টার গ্রাস কবি, নাট্যকার, ভাস্কর এবং গ্রাফিক ডিজাইনারও ছিলেন।

● **লন্ডনে গান্ধীমূর্তির উন্মোচন :**

লন্ডনের পার্লামেন্ট স্কোয়ারে গান্ধীমূর্তির উন্মোচন করলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন, ভারতীয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এবং গান্ধীজির পৌত্র তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীও উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

ন'ফুটের এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি তৈরি করেছেন ভাস্কর ফিলিপ জ্যাকসন। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৩১ সালে একবার লন্ডনে এসেছিলেন গান্ধীজি। ১০ ডাউনিং স্ট্রিটের সিঁড়িতে সে সময় গান্ধীজির যে ছবি তোলা হয়েছিল, সেই ছবিই এই মূর্তি তৈরির অনুপ্রেরণা।□

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী